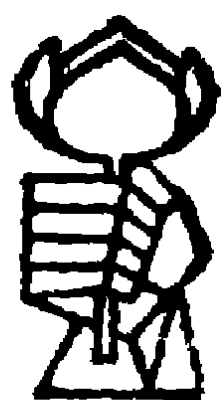


বিবীচিত কবিতা



কথাসিল্প

১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৩৬৭
জুলাই ১৯৬০

প্রকাশক
অবনীন্দ্রনাথ রায়
১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রাকর
এন. সি. শীল
ইম্প্রেশন সিকিউরিটি
২৬/২এ তারক চ্যাটার্জী লেন
কলিকাতা-৭০০০০৫

জন্ম

মেঘে মেঘে রক্ত ঝরে, রক্ত ঝরে আকাশ মাটিতে
হাওয়ায় ; হাওয়ার মতো হৃদয়ের ভাবনাগুলিতে
রক্ত ঝরে ; নীল মেঘ, কালো মেঘ, সাদা বলাকার
মতো সারি সারি মেঘ রক্তে রঙে হয় একাকার
ঝতুর দাহনে ; পোড়ে মেঘের অরণ্য, মেঘগ্রাম ;
মনের সহস্র গলি রক্তস্নাত জানায় প্রণাম
ক্রান্তিলগ্ন আবির্ভাবে । অদৃশ্য গ্রহের হাতে লাগে
রক্তটিপ ; স্নান-ছেঁড়া নবজাত শিশুর ললাটে
শনি করে মঙ্গলস্পর্শ ; মঙ্গল আগ্নেয় তুলি নিয়ে
আঁকে লালবর্ণ ছবি । জন্মময় অসহ্য যন্ত্রণা
ভুলে তা জননী জ্বাখে থরোথরো ! মায়ের বেদনা

দেখে বিধাতাও একবার তার আদেশ ফেরাতে
ফিরে আসে ; স্তব্ধ হয় ; শিশুর ছ'চোখে ঝরে সোনা

যতীন দাসের ফটো

কুৎসিত ঝাঁকানো মুখে জীবনের অদ্ভুত উৎসব
অফুরন্ত আলোকের উদ্ভাসিত ঐশ্বর্যে, প্রাবনে ;
ধীরে ধীরে সেই মুখ হয়ে এলো আশ্চর্য সুন্দর
অবিশ্রাম তারা-ঝরা জীবনের বর্ষণে ও গানে ।

অনেক দেখেছি ছবি, দেখিনি উন্মত্ত দ্বিপ্রহর
পদ্মার কি মেঘনার নীলকণ্ঠ স্বর্ণায়ু জটায়,
সাপ-খেলানোর নেশা মৃত্যু দিয়ে কেনে বাজিকর
দেখিনি এমন ছবি মথুরায় কিম্বা অযোধ্যায়
কোনদিন ! আজ দেখি রঙচটা তথাপি বিচিত্র,
অসুন্দর, তবু মুখ সূর্যের কি সমুদ্রের মিত্র ।

এই ছবি দেখে দেখে স্পষ্ট হ'লো কেন মরা হাড়ে
দধীচি এখনো বজ্র ? সব গ্রহ আগুন তো নয়
একথা যেমন সত্য, তবু কেউ পুড়ে যেতে চায়
পৃথিবীকে আলো দিয়ে, কী আশ্চর্য, সে-ই সূর্য হয় !

দোল ও পূর্ণিমা

সর্বত্রই এক মুখ : রঙে রঙে একাকার কিশোর মিছিল ;
যেন এক ঝাঁক ছিল
দ্বিপ্রহরে শ্রান্ত হয়ে দিধির ভেতরে
সূর্যের বলের মতো রঙের চেতনা নিয়ে ক্লান্ত খেলা করে ।

সর্বত্রই এক ক্লাস্তি, শোলোক ফুরুলে
চুলের আবীর নিয়ে ঘুমায় স্বপ্নের শিশু ঠাকুর কোলে ।
আকাজ্জায় পুড়ে যায় রূপকথার নক্ষত্রের অদৃশ্য কপাল...
একাকী যুবতী চাঁদ মাঝরাতে ফাঁকা ট্রেনে চুরি করে দুর্ভিক্ষের চাল ।

স্বদেশ

ভোর হল—

গানে নয় ; হাওয়ার জ্বরে, শিশিরের ফিসফিসানিতে কোনো গান নেই ; কোনো নিষাদের স্বপ্নভঙ্গের অসহ্য পুলকে আলোকের ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় সূর্যমুখীর জন্ম-লাভের চেতনাঝংকার এখানে নেই ... শুনি বিছানায় শুয়ে রাতশেষের কুকুরের কান্না, কাকের চিংকার ; বহুদূরের কোনো মালগাড়ির একঘেঁয়ে গোড়ানি । ট্রেনের চাকার নিচে পিষে যাচ্ছে মাটি ; যন্ত্রণায় ধরিত্রী কেঁপে উঠছে—

সূর্যদেব, তোমার ঘুম কি ভাঙল ?

পোড়ো জমি খাল নদী পথ । শীতে মৃত শিশির করে পড়ছে সূর্যমুখীর ডালে ডালে ; ফুল তবু ফোটে না ! যেখানে হেমন্ত-রাত্রিশেষের ক্লান্ত পদধ্বনি শুনে শুনে শেফালি বালিকারা মৃত্যুবরণ করেছে, সে মাটি এখন বক্ষা ! ইতিহাসের কী নির্বোধ পরিহাস !

কথা বলো, সূর্যদেব ! কথা বলো ! এই শীত, এই চিরকুণ্ড বুদ্ধের উত্তাপহীন কর্কশ বিলাপ আমাদের ক্লান্ত করে...ক্লান্ত...

কিন্তু কেন এই পোড়ো জমি মরা নদী গ্রাম হাওয়া আর হৃদয় ? যেন ভোরবেলা এসে দাঁড়িয়েছি শতাব্দীর নিঃশব্দ কবরখানার পাশে ; যেন প্রেতাত্মার রুদ্ধ নিঃশ্বাস কোন্ ধূসর মৃত্যুর প্রান্তরে আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে আশাহীন অসহায় রাত্রির রক্তাক্ত শিকারের মতো ! তবে কি, এইমাত্র রেললাইনে দাগ কেটে কেটে যন্ত্রণার যে-মালগাড়ি গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে চলে গেল, তার কোটরে কোটরে বৃদ্ধ মরা নিরুৎসাহ সভ্যতার লাশগুলি পাশাপাশি শুয়ে আছে যুদ্ধশেষের সাজান ক্লান্তির স্বাবর পাহারায় ?

আমরা তো আজ মুক্ত, হে আলোর ঈশ্বর ! স্বাধীন দেশ প্রান্তর মাঠ অশ্বখ চারাগাছ বন্দর ! তবু কী বীভৎস এই আভিধানিক সন্তাষণ—ধর্মপুত্রের কস্মকণ্ঠোচ্চারিত ভ্রষ্ট অশ্বখামার আদিম মৃত্যুসংবাদ ! তুমি তো জানো সূর্যদেব, বন্দী জনসমুদ্র ফুলে কেঁপে উঠেছে শৃঙ্খল-যন্ত্রণায় ! স্বাধীন স্বতন্ত্র প্রান্তরে একটি চারাগাছও আজ পল্লবিত নেই !

বেকার জীবনের পাঁচালি

কিবা আসে যায় আশ্বিনে যদি আকাশ বিষায় কালো মেঘে
শরতের রোদ মুছে নিয়ে যায় মরা শ্রাবণের মেঘে মেঘে
হেমন্তে যদি বাতাস ফোঁপায় কিংবা পঙ্কপাল আসে
অসময়ে গাঁয়ে খামারে গঞ্জে বস্তিতে বাঁকা নীত হাসে
তাতে আমাদের কতটুকু ক্ষতি, মিতে !
এসো, তালি-দেওয়া জুতোজোড়ায় সঘড়ে বাঁধি ফিতে !

কিবা আসে যায় বন্দর যদি শ্মশানের ছাই গায়ে মাথে
ঘরে ঘরে মরা শিশুর কান্না ক্ষুধিত মায়েরা মনে রাখে
কাব্যের ফাঁকে 'নেই নেই' ঢোকে, জাত-কবিদের ভাত মাঝে
কিংবা শিল্পী স্বপ্ন বানায় হাজার শিশুর মরা হাড়ে
আমাদের দিন বদলায় নাকো, মিতে !
হাঁ-করা জুতোটা অবাধ্য বড়ো, ভালো করে বাঁধো ফিতে !

কিবা আসে যায় চাঁদ যদি ফেরে লজ্জায় ঘরে উকি দিয়ে
কড়িকাঠে ঝোলে বিবসনা নারী হবু-কবিদের ফাঁকি দিয়ে
কিংবা সাগর ফুলে ফেঁপে ওঠে, গর্জায় আর চোখ রাঙায়
উজিরের ঘুম ভাঙে অসময়ে, কোটাল সভয়ে বিদেশ যায়
আমাদের চলা এতেই কি শেষ হয় ?
দাঁতালো পেরেক, তালি-খাওয়া জুতো অনেক কথাই কয় !

লাল শপথের রাখি

শহরে এখন সন্ধ্যা নেমেছে, ত্বিতির কথকতা...
ফ্যান দাঁও বলে কারা কঁাদে রাস্তায়
ঘরে নেই ভাত, মাগো, তুই কাছে আয়—
আমি পড়ি বসে কুণির আলোয় জীবনের রূপকথা ।

নিৰ্বাচিত কবিতা

আমি পড়ি বসে শীতের তুধারে নভেম্বরের গান :

দশ দিন যেন দশটি ঝড়ের ছেলে

মরণকে দেখে হেসে দিল বাহু মেলে—

রূপকথা নয়, ইতিহাস মাগো, ক্ষুধিতের অভিযান ।

চোখে কেন জল, চোখ মুছে দ্যাখ্, হৃদিনের উপবাসী

ছেলে তোর আজ একটু কাতর নয়—

বুক বাঁধ তুই, আমাদেরই হবে জয়

শীতের তুধারে কান পেতে শোন্ ঝোড়ো বাতাসের হাসি

শহরে গভীর রাত্রি ঘনায়, তুই আমি বসে থাকি ;

আমি পড়ি বসে পৃথিবীর উপকথা

তুই ছয়োরাণী, ভোল্ রাত্রির ব্যথা—

কাল ভোরে হাতে পরিয়ে দিস্ মা, লাল শপথের রাখি !

মিছিলে

বোকা ছেলেটার হল এ কী

পেটে নেই ভাত, পাগল তাই ?

মিছিলে মেলার নেশায় কী

মরণেরও ভয় ছেঁড়ে সে কী !

বোকা ছেলেটার হল এ কী ?

লাঠি, গুলি, গ্যাস, যায় বুধাই ;

এগিয়ে চলেছে : অন্ন চাই !

বোকা মেয়েটার হল এ কী

ঝুটি নেই, তাই ক্লান্তি নেই ?

সামনে ধুলোয় ঘুমিয়ে কে,

হোলি খেলে বুকি শুয়েছে সে !

বুকের মধ্যে নিল ওকেই ;

আবীর মাখল ধুলো মুখেই !

রুটি দাও

হোক পোড়া বাসি ভেজাল মেশান রুটি
তবু তো জঠরে বহি নেবানো খাঁটি
এ এক মন্ত্র : রুটি দাও, রুটি দাও !
বদলে বন্ধু, যা ইচ্ছে নিয়ে যাও !
সমরখন্দ বা বোথারা তুচ্ছ কথা
হেসে দিতে পারি স্বদেশের স্বাধীনতা ।

শুধু দুইবেলা ছুটুকরো পোড়া রুটি
পাই যদি তবে সূর্যেরও আগে উঠি ।
ঝোড়ো সাগরের ঝুঁটি ধরে দিই নাড়া
উপড়িয়ে আনি কারাকোরামের চূড়া ।
হৃদয়, বিষাদ, চেতনা তুচ্ছ গণি
রুটি পেলে দিই প্রিয়ার চোখের মণি ।

তোমার স্বপ্নের মঠ

(কবি গোবিন্দচন্দ্র দাসের জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে)

সতত তোমার আর্তি আমার রাত্রির ঘুম থেকে
তৃপ্তির আলস্য নিয়ে খেলা করে ; নিশির যন্ত্রণা
একতারার মতো বাজে ; শ্রান্তিহীন রক্তের অস্থখে
বিবর্ণ সান্নিধ্য আনে অস্থতির আমৃত্যু সান্ত্বনা ।

সতত তোমার ক্লাস্তি আমার নির্বোধ হাহাকারে
মল্লারের সুর বাঁধে, কালের গলিতে তমসায়
ফণিমনসার ঝোপে, সূর্যোদয় রক্তাক্ত গহ্বরে
সর্বাঙ্গে প্রহারকৃত দ্বিপ্রহর সঙ্গীত ছড়ায় ।

নির্বাচিত কবিতা

সতত তোমার মোঁন আমার জীবনে স্মৃষ্ণমুখী
মৈত্রীর আশ্বাসে ফোটা একটিই আরক্ত কুসুম
দীর্ঘশ্বাসে ছিঁড়ে নেয় ; নিঃফলের সঙ্কায় একাকী
নিঃসঙ্গ গায়ত্রীমন্ত্রে পুড়ে যাই ; নিবস্ত নিব্বাস
রোগশয্যায় তবু জ্বলি : ধু ধু মাঠ, অবাক জোনাকি ;
প্রলাপের নটী নাচে মৃত্যুস্তীর্ণ ললাটে কুসুম ।

পলাতক মনের প্রতি

সূচীভেদ্য অঙ্ককার ! একা এই অজ্ঞাতবাসের
শান্তি : জানিনে কী আছে ডানে, বাঁয়ে, সামনে কী ?
বন্দর, থামার কিংবা অরণ্য কি আগ্নেয়গিরির
কোন্ সভা ?...আলো দাও, সাড়া দাও ! ডাকি

প্রাণপণ ! ডাকি—কোন সাড়া নেই । কোন আলো নেই
এ মহানিশায় ! সামনে কে ? কেউ নেই, শুধু সাপ,
সেও পলাতক ! শুধু হাওয়া, সেও ভয়ে ভয়ে যায়
এই রাজ্য ছেড়ে ! কিংবা একি রাজ্য ? নির্বোধ ! প্রলাপ

তবে বুঝি ? তবে বুঝি জ্বর ? কিন্তু হিম দেহ...স্থির ;
এ কি মৃত্যু ? তবে মৃত্যু এই !...শূন্য মস্তিষ্কের দাহ
মৃত্যুও না মোছে যদি । যদি নাম, স্মৃতিদের ভিড়
জনশূন্য এ শ্মশানে অশরীরী আনে বার্তাবহ
'রুটি দাও, রুটি দাও, রুটি দাও'—আকণ্ঠ চিৎকারে,
তবে ফিরে চলো মন হৃৎপিঙ্কের মিছিলে, বন্দরে ।

সুদিরামের কাঁসি

সে এক অদ্ভুত রাত্রি ! ঐমথমে রক্তমাখা মুখগুলি জ্বরে
অকথ্য প্রলাপ বকে, দীপ-নেভা অন্ধকার বিছানায়, ঝড়ে
বুকগুলি তোলপাড় । জানালায় জল্লাদের হাতের মতন
কালো হাওয়া নড়ে চড়ে, হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে । নেকড়ের গর্জন
নগরেও শোনা যায় ; কুয়াশায় কাঁপ দেয় সারিবদ্ধ বাঘ—
সে এক অদ্ভুত রাত্রি ; ক্রান্তির শিয়রে ক্রান্তি লেখে পূর্বরাগ !

সেই রাতে ফিস্ ফিস্ রুগী আর নার্সের অশ্রুট গলায়
ভয়, শুধু ভয় কাঁপে, তারপর ধীরে ধীরে কেটে যায় ভয়—
কে যেন নির্ভীক হাসে । ভীষণ কঠিন হাসি প্রত্যেক দরজায়
বিবর্ণ রাত্রির চোখে চোখ রাখে, কথা বলে, ছড়ায় বিষ্ময় ।
অন্ধকারে সেই হাসি আলো যেন, জ্বলে দিল সমস্ত বন্দর ;
ঘরে ঘরে যুবতীরা খিল খোলে, যুবকের ছেড়ে যায় জ্বর ।

ধীরে রাত্রি স'রে যায় । শুদ্ধ ভোরে স্নান সেরে বাইরে এলাম...
কাঁসির মঞ্চে কাল হেসে গেছ, গেয়ে গেছ, তুমি সুদিরাম !

নতুন চীন

(আধুনিক রূপকথা)

শিশু জন্ম নিল...

জন্ম নিল ঘুঁটে-কুড়ুনীর ঘরে
সাঁতসেঁতে মাটির বিছানায়
অযত্নে, ধুলো আর হাহাকারের মধ্যে ।

এ তো নয় আবির্ভাব, নয় কোনো প্রভাত-সূর্যের গান
সূর্যের আলো ঢুকতেই পায় না রক্ত আর কাদায় মাখা জননীর আঁতুড় ঘরে
শিশু ক্ষুধায় যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠে,
কারো বুকে নেই একফোটা দুধ, কে মেটাবে তার ক্ষুধা ?

তবু জন্ম নিল

শিশুই জন্ম নিল আবর্জনার মধ্যে, এঁদো গলিতে, নোংরা লোকেদের পাড়ায় ।

যাদের ঘরে নেই ভাত, পরনে নেই কাপড়

তাদের মধ্যে, তাদের উপোসের খুদকুঁড়োয় ভাগ বসিয়ে

দুয়োরাগীর ছেলের শৈশব কাটল ।

তারপর...একদিন

মার খেয়ে খেয়ে যাদের কোমর গেছে ভেঙে, তাদেরই

কোলে চড়ে শিশু সূর্য দেখল

রক্তাক্ত, ভীষণ ক্রান্তিলগ্নের সূর্য !

ধীরে ধীরে শিশু বড় হল, দুয়োরাগীর ছেলে মানুষ হল,

অথবা মানুষ নয় সে, মানুষেরই মতো দেখতে, কিন্তু...

যে ভাষায় পড়শীদের ছেলেরা তোতাপাখির ছড়া কাটে

সে ভাষায় এ ছেলে কথা বলে না, বোঝেও না ।

যে পথে মানুষের ছেলেরা মার বেঁধে ইঁসুলে যায়

দুয়োরাগীর ছেলে সে পথ মাড়ায় না, হয়তো চেনেও না ।

সবাই বলে : 'এ কী অমঙ্গল ! গুকে দূর করে দাও,

নইলে বিপদ ঘটবে !'

সবাই বলে, শুধু জননী শোনে । তার মনে পড়ে রক্ত আর

কাদায় মাথামাথি একটি স্মৃতি—

এত রক্ত, এত যন্ত্রণা কি ব্যর্থ যাবে !...বুকে চেপে শিশুকে সে আগলে রাখে ।

পড়শীদের করুণা হয় ; উচ্ছিষ্টের ভাগ দিয়ে তারাই তো

এ শিশুকে বাঁচিয়ে তুলেছে ।

তারপর

শিশু যুবক হল, কিন্তু এ কি ভীষণ চেহারা তার !

কপালের শিরা-উপশিরাগুলি যেন ছিঁড়ে, ফেটে বেরতে চায়—

চোখের দিকে তাকানোই যায় না, এত আগুন, সেখানে এত তাপ—

হাত-পা'গুলি কাঠি কাঠি, কিন্তু বুকটা ভীষণ চওড়া ; এত চওড়া

যে অস্বাভাবিক ঠেকে ।

কেউ কেউ বলে : ‘এখনো তাড়াও, এখনো সময় আছে ।’

দুয়োরানী ভাবে, হয়তো এই আবির্ভাব...হয়তো... ?

এরপর শুরু হল রূপকথা । এঁদো গলিতে, নোংরা লোকেদের পাড়ায়
তবু শুরু হল ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর গল্প ।

যাদের ঘরে নেই ভাত, পরনে নেই কাপড় ;

যাদের নতুন বউ রাঙা বউ হাহাকারে যজ্ঞায়

ধুলোয় লুটিয়ে কাঁদে, তারপর গলায় দড়ি দেয়—

সেখানেও শুরু হল অপরূপ সেই উপন্যাস, বিস্ময়কর, কিন্তু সত্য !

জন্ম থেকে বহুদিন যে ছেলে সূর্য দেখে নি, সূর্য জ্বলল তারই চোখে ;

সমস্ত বন্দরটা জালিয়ে দিল ।

অবাক বিস্ময়ে পাড়ার লোকেরা দেখল

দুয়োরানীর লক্ষ পাইক, কোটি বরকন্দাজ সে-দৃশ্যের সামনে

পাথরের মতো সারে সারে দাঁড়িয়ে আছে—

তাদের চোখে পলক নেই, শরীরে স্পন্দন নেই ।

সতীন-পুত্রেরা রাগে হতাশায় শুধুই চিৎকার করছে :

‘মেরে ফেলো এ সাক্ষাৎ অমঙ্গলকে, জীবন্ত গেঁথে ফেলো !’

কিন্তু কে তুলবে হাত দুয়োরানীর ছেলের গায়ে,

কে গেঁথে ফেলতে পারে জীবন্ত সূর্যের প্রচণ্ড অগ্নিশিখাকে ?

যারা এক-পা এগিয়েছিল, আগুনের চাবুক খেয়ে

দু-পা পিছিয়ে এল তারা ।

পড়শীরা জয়ধ্বনি করে উঠল : ‘আমরা বাঁচিয়েছি

তোমাকে, আজ তোমারই আশ্রয়ে আমরা বাঁচব !

তুমি সামনে থাকলে ভয় করিনে কোনো অত্যাচারকেই,

কারণ অত্যাচার তোমাকে ভয় করে ।’

দুয়োরানীর বুকে ঝড়, মুখে আলো, চোখে শান্তি—

মেঘ নেই, মেঘ কেটে গেছে ।

একটি বিশেষ দিনের প্রার্থনা

সে মেঘ কোথা পাই
 যে মেঘে কান্নার
 অশ্রু নেই, ক্ষীণ
 ছায়ার মতো মা'র
 কোলেই শিশু আর
 কাঁপে না। ভাত দাও :
 উপোসী ভাঙ্গা ঘরে
 যে মেঘ ঘরে ঘরে
 শোনে না হাহাকার ;
 সে মেঘ কোথা আছে
 যে মেঘে আলো নাচে ?

সে মেঘ কোথা থাকে
 শিয়রে রোগা মা-কে
 জ্বাখে না অসহায়
 শিশুর চোখে চাওয়া ;
 জানে না পথে পাওয়া
 রোগের চেয়ে ভয়
 জোয়ান স্বামী আনে,
 রুটি না পথা না
 কেবল কালো হাওয়া।
 সে মেঘ কোথা পাই
 যে মেঘে ব্যথা নাই ?

তুমি কি আছ মেঘ হাসির নীল মেঘ গানের আলো মেঘ,

কোথায় কোন্ দেশে

নিরুদ্দেশ তুমি, তাহলে ! কান্নার রোগের কথা শুধু শ্রাবণে ভাদ্রেও

অসহনীয় লাগে। এ কোন অভিশাপ ! এখানে এই ঘরে ব্যথার আড়িনায়।

এ কোন্ : দাও দাও, এ কোন্ : নেই নেই -হাওয়ার চিৎকার
মাটির হাহাকার ?

আলোর মেঘ এসো ! ঘুচাও বেদনার রাত্রি মুছে নাও ভোরের কুয়াশার
সকল যজ্ঞা । একটু বসো তুমি ; হৃদয় হোক সোনা এমন আকালেও ।
[সংশোধিত]

বেহুলা

সে জাগবে । জাগবেই । আমি তাকে কোলে নিয়ে
ব'সে আছি রক্ত পুঁজে মাথামাথি রাত্রি
ভেলায় ভাসিয়ে । আমি কান্নার যজ্ঞা
গঙ্গায় সাগরে রেখে কাক তাড়াই । যাত্রী

যারা ভিড় করে, হায়না, শকুন, শেয়াল—
কেউ বন্ধু নয় । লুক্ক শিকারীর থাবা
ধারালো দাঁতের কশা দ্বিপ্রহরকেও
ছিঁড়ে ফেলে । তবু আমি বাংলার বিধবা

সতী, তাকে ফিরে পাব, হয়েছি সাবিত্রী !
পাতালে নরকে কিংবা যমের দুয়ারে
যেখানে ভিড়বে ভেলা, যাব । সমুদ্রেও
শান্ত প্রতীক্ষার স্তোত্র গাঁথব পয়ারে ;

গান দেব, জলব, কিন্তু হব না অঙ্গার ;
সে জাগবে, জাগবেই, লখিন্দর সে আমার ।

বর্ষা

কালো মেঘের ফিটন চ'ড়ে
 কালিঘাটের বস্তিটাতেও আষাঢ় এল ।
 সেখানে যত ছন্নছাড়া গলিরা ভিড় ক'রে
 থিদের জালায় হুগলি-গঙ্গাকেই
 রোগা মায়ের স্তনের মতো কামড়ে ধ'রে বেহঁশ পড়ে আছে ।

আষাঢ় এসে ভীষণ জোরে ছুয়ায়ে দিল নাড়া—
 শীর্ণ হাতে শিশুরা খোলে খিল ।

নচিকেতা

কেন ফিরে আস বারবার ?
 স্মৃতির তুষার থেকে কেঁদে এসে শীতের তুষার
 কেন হেঁটে পার হতে চাও ?
 এমন নির্জন রাতে যেই ভয়ে নক্ষত্র উধাও
 অনন্ত আকাশ থেকে, সে নির্মম মেঘের কুয়াশা
 কোন স্থখে বুকে টান ? এ নরকে কিসের প্রত্যাশা ?

তুমি কি জান না ; যারা আসে
 আকর্ষণ পিপাসা নিয়ে সূর্যহীন এ মৌর আকাশে
 চারদিকের মৃত গ্রহদের
 কবর, প্রস্তর ভেঙে আসে ; তারা নিজেরই রক্তের
 পিপাসায় জ্বলে ! কোনোখানে নেই এক ফোঁটা জল ;
 দীর্ঘস্বাসে দ্বিখণ্ডিত এ মাটির অশ্রুই সম্বল ।

কেন তবে সব ভুলে যাও ?
 এ প্রেতপুরীর বুকে মুখ রেখে কোন্ স্থখ পাও ?
 আসমুদ্রহিমাচল এই মহাশূন্যের কান্নায়
 কেবল পশুর নখ দাগ কাটে ; বিধাত্ত হাওয়ার

সাপের খোলসগুলি ভাসে শুধু ; আর
দিন-রাত্রির বুকফাটা 'নেই নেই নেই'-এর চিৎকার ।

সে চিৎকারে স্বর্গ-মর্ত্য টলে
পাথরও চৌচির হতো ভারতবর্ষের বক্ষ্যা পাথর না হ'লে ।
জঠরের অসহ ক্ষুধায়
ধূমাবতী জন্মভূমি সন্তানের দুর্ভিক্ষের ভাত কেড়ে খায় ;
এ কী চিত্র ! নরকের সীমা
চোখ অন্ধ করে দেয়, মুছে নেয় চেতনার সমস্ত নীলিমা ।

তাই নিয়ে নচিকেতা, তবু তুমি গড়বে প্রতিমা ?
অন্ধ হবে, বোবা ও বধির
তবু ক্রান্তিহীন, মৃত্তিকায় পুনর্জন্মের অস্থির
জিজ্ঞাসায় মৃত্যুর তুষার
বারবার হেঁটে হবে পার ?
অগ্নিদগ্ধ দুই হাতে কতবার খুলবে তুমি যমের দুয়ার ?

৭ নভেম্বর

এক

একবার, শুধু একবার তুমি জ'লে উঠেছিলে
হৃদয় আমার, ক্রান্তিবলয়ে তিমিরাস্তক ;
দু'হাতে সরিয়ে আধারের যবনিকা
হেসে উঠেছিলে ভোরের দারুণ দীপ্ত তেজে,
অগ্নিশিখা ।

একবার, তবু একবার সেই চির-প্রোজ্জ্বল আলোর দেশে
চেতনা আমার পেয়েছিল আশ্রয়
হৃদয়, তুমিই দিয়েছিলে বরাভয় ;
শীতের তুষার গ'লে হ'ল হৃদ ভীষণ বিক্ষোভে,

হলুদ পাতার পাতুর মুখে বসন্ত খেল চুম্
একবার, সে তো একবার ।

একবার, তবু একবার আমি মানুষের ছেলে
মানুষেরই মতো হেসেছি, বেঁচেছি, মানুষের মতো
গান গেয়ে গেছি নভেম্বরের দারুণ শীতেও
কালবৈশাখী ঝঞ্ঝার সুরে উন্মাদ-প্রাণ
সঙ্গী আমার, আমরা খেলেছি জীবন-মৃত্যু খেলা ।
গাছে গাছে ফুল ফুটিয়েছি, মাঠে মাঠে পাকা ফল
হাটে হাটে আমি ক্ষুধার ফসল
বিলিয়ে দিয়েছি, এই আমি, 'আহা' হৃদয় আমার,
তোমারই মন্ত্র করেছি উচ্চারণ !
হাত ধ'রে তুমি কোথায় যে নিয়ে গিয়েছিলে, কোন্ আলোর শিবিরে
একবার শুধু দশটি দিনের অগ্নিগর্ভ শীতের তুষারে
দিন-বদলের চৈতালী উৎসবে ।

দুই

তারপর সূচীভেদ্য অঙ্ককার ! নভেম্বরে, শীতে
সর্বত্র তুষার ঝরে ; এপ্রিলেও সে দুর্দিন যায় না ।
মে-দিনের বৈতালিকে কী আশ্চর্য, সমুদ্র গর্জায় না !
ইউরোপে, এশিয়ায়, কোথাও হৃদয় দিতে নিতে
মানুষ হাঁটে না আর । ইতিহাস কাঁধামুড়ি দিয়ে
সেই যে ঘুমাল ; স্বর্গ-নরকের বিষন্ন বিবাহ
কাসর-ঘণ্টার আর্তনাদ কিংবা কাস্তুর কান্নায়
সে নিদ্রা ভাঙে না আর । সস্তা ভাঙে আফিম মিশিয়ে
বিবাহ-বাসরে গড়াগড়ি যায় মাতাল-মিছিল,
কেউ বা হাতড়ায় শাস্তি, কেউ বা গলিতে, নর্দমায়
দর্শন বমন করে । কেউ ফুক, আন্বাড়ি যায়
মাঝরাতে কল্যাপক ক্রুক, যদি ঘরে দিল খিল !

চার্লিস, ট্রুম্যান, ওম'। অভ্যাগত বরযাত্রীর বেশে ;
শান্তির সানাই বাজে এমন কি দুর্ভিক্ষেরও দেশে ।

তিন

হে হৃদয়, জ্যোতির্ময় ! এ অসহ তিমির-শায়ক
সাজে না তোমার তুণে ! তুমি যোদ্ধা আরেক শিবিরে
শ্রমিকের, কৃষকের ! ঘৃণ্য চেতনার ক্রান্তি ছিন্ন পোশাকের
মত ছুঁড়ে

আবার জ্বলবে না তুমি মধ্যদিনে অপরূপ হিরণ্যপাবক—

অগ্নিবর্ণ, অগ্নিচক্ষু, অগ্নি-উত্তরীয়
হে আমার দুর্দিনের প্রিয় ?

চার

তোমার জ্যোতি যেন ভোরের জবা
শীতেও যেই ফুল প্রভাতে সুধা ঢালে
তোমার গান যেন অরুণোদয়
রাত্রি ছিঁড়ে নীল আকাশে বাহু মেলে ।

তা'হলে জাগো তুমি, তাহলে জ'লে ওঠো
কবর থেকে ছাখো লেনিন মাথা তোলে—
কবর থেকে সেই মানুষ মাথা তোলে
পাহাড়ে, সাগরে ও তেরটি নদীকূলে ।

৭ নভেম্বর, ১৯৫২

ভিসা অফিসের সামনে

দুটি মানুষ দুই পথে চলে গেল ।
যতক্ষণ মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা যায়
ওরা অপেক্ষা করেছিল ।

একজন অশ্রুট কণ্ঠে বলেছিল,
আসি !

আরেকজন অনুভব করেছিল সৎভাইয়ের যন্ত্রণা ।

ছুটি কঠিন পাথরের মুখ,
খোদাই করা নিম্প্রাণ দুই জোড়া ঘোলাটে চোখ,
অদৃশ্য রক্তের তোলপাড়ে একই অধিকারে মৃত পিতাকে স্মরণ করেছিল ।

আর এখন, এমন দিনে
যদি সে মুখ আবার মনে পড়ে, রক্তে বাজে না-দেখার কঠিন ব্যর্থতা,
তখন কোথায় কোন রাস্তায় এসে দাঁড়াবে
ছুটি সৎভাই, সমস্ত আকাশটাই যেখানে দেয়াল দিয়ে আপাদমস্তক ঢাকা ?

প্রতিবাদ

এভাবে মানুষ নিয়ে খেলা
মানুষের স্বপ্ন সাধ বিশ্বাস সম্মান মনুষ্যত্ব নিয়ে
মানুষের মস্তিষ্ক হৃদয় নিয়ে
হৃৎপিণ্ড ধমনী রক্ত অস্থি নিয়ে
চক্ষু জঠর গর্ভ পৌরুষ মাতৃত্ব নিয়ে খেলা

গর্ভের সন্তান আর তার ও পর যারা আসবে
আর যারা ইতিমধ্যে হামাগুড়ি দিচ্ছে, বইখাতা নিয়ে স্কুল কিংবা কারখানায়
যে-সব শিশু বালক-বালিকা,
স্বাধীন দেশেই যারা জন্মেছে, স্বাধীন দেশে জন্মাবে,
তাদের স্বাস্থ্য ঘরবাড়ি পড়াশুনা নিয়ে
তাদের মুখের ভাত নিয়ে এই খেলা
জন্মভূমি নিয়ে, দেশের নগর গ্রাম খামার কারখানা নিয়ে

দেশের সীমান্ত নিয়ে, দেশের ভিতর
 পোস্টাফিস রেলগাড়ী রাস্তাঘাট হাসপাতাল স্কুল-কলেজ নিয়ে
 দেশের ভূগোল ইতিহাস বিজ্ঞান সাহিত্য নিয়ে
 গান নিয়ে, ছবি নিয়ে, নুন আর রুটি নিয়ে
 দেশের আকাশ জল মাটি আলো অন্ধকার নিয়ে
 এই খেলা, এই ভয়ঙ্কর খেলা

এর চেয়ে আর কী নরক, স্বাধীন স্বদেশে !

১৪ অক্টোবর, ১৯৬৩

অন্নদেবতা

“অন্নমিতি হোবাচ সর্বাণি হবা ইমানি ভূতান্নামব
 প্রতিহর মাণানি জীবন্তু সৈষা দেবতা...”

ছান্দোগ্যোপনিষদ

অন্ন বাক্য অন্ন প্রাণ অন্নই চেতনা ;
 অন্ন ধ্বনি অন্ন মন্ত্র অন্ন আরাধনা ।
 অন্ন চিন্তা অন্ন গান অন্নই কবিতা,
 অন্ন অগ্নি বায়ু জল নক্ষত্র স্রবিতা ॥

অন্ন আলো অন্ন জ্যোতি সর্বধর্মসার
 অন্ন আদি অন্ন অন্ত অন্নই ওকার ।
 সে অন্নে যে বিষ দেয় কিংবা তাকে কাড়ে
 ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, ধ্বংস করো তারে ॥

অগষ্ট ১৯৬৪

স্বদেশ ২

গঙ্গানদী প্রবাহিত ; প্রবাহিত চিতা, শবদেহ
হরিধ্বনি । প্রবাহিত পুণ্যকামী পুরুষ, নারীর
পদচিহ্ন । নর্দমার চেয়ে পুতিগন্ধময় জলে
শান্তি । হাঁটু-অঙ্গি স্নানে স্নিগ্ধ হচ্ছে পাপীর শরীর ;

পাপ যাচ্ছে রসাতলে ; আত্মা হচ্ছে পদ্মের মতন ।
পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছে থুথু, মল, গলিত কুকুর ;
তবু প্রবাহিত...প্রাণ প্রবাহিত । স্বদেশ আমার,
মুখ দেখ্ ! এই তোমার নদী, তোমার পবিত্র মুকুর,

কলকাতার খাল ; যাতে আমরা বুক রাখছি, জন্মান্তর !
প্রবাহিত মনুষ্যত্ব...নরকের গর্ভের ভিতর ।

মুখে যদি রক্ত ওঠে

মুখে যদি রক্ত ওঠে

সেকথা এখন বলা পাপ ।

এখন চারদিকে শত্রু, মন্ত্রীদেব চোখে ঘুম নেই ।

এ সময়ে রক্তবমি করা পাপ ; যন্ত্রণায় ধনুকের মতো

বঁেকে যাওয়া পাপ ; নিজের বৃকের রক্তে স্থির হয়ে শুয়ে থাকা পাপ ।

আশ্চর্য ভাতের গন্ধ

আশ্চর্য ভাতের গন্ধ রাত্রির আকাশে

কারা যেন আজও ভাত রাঁধে

ভাত বাড়ে, ভাত খায় ।

আর আমরা সারারাত জেগে থাকি

আশ্চর্য ভাতের গন্ধে,

প্রার্থনায়, সারারাত ।

কালো বস্তির পাঁচালি

১

কালো রাত কাটে না, কাটে না
এত ডাকি, রোদুর এই পথে হাঁটে না—
ঘরে না, মাঠে না।

স্থিা ঠাকুর, শোনো, স্থিা ঠাকুর গো,
আমাদের খোকাখুকু তোমারও কি পর গো ?

২

মাগো, এত ডাকি ক্ষিদের দেবতাটাকে
বেশি নয় যেন ছ'বেলা ছ'মুঠো হুনমাখা ভাত রাখে—
তুই আর আমি দুঃখ ভুলবো, ভুলবো পেটের জ্বালা ;
ক্ষিদের দেবতা, সে কী একেবারে কালো !

বাছা রে, আমরা অচ্ছুৎ, তাই যেভাবে যতই ডাকে
কোনো দেবতাই বস্তিতে আসে নাকো।

৩

আয় রোদুর, আয়।
আয় আমাদের গ্যাংটা খুকুর নোংরা বিছানায়।
আয় রোদুর, বস্তিতে—
আধমরা ঐ খুকুর ঠোঁটে একটু চুমুর স্বস্তি দে।
আয় লক্ষ্মী, আয় রে সোনা !
এইটুকুতেই জাত যাবে না।

আয় রোদুর, আয় !
দারুণ শীতে খুকু মোদের ঠাণ্ডা হয়ে যায়।
আয় রে শীত মাড়িয়ে—
ভয়ের জুজু ডাইনী বুড়ীর চুল ধ'রে দে তাড়িয়ে।

আয় লক্ষ্মী, আয় রে সোনা ।
রাত গেলে কী ভোর হবে না ?

৪

শূণ্য উঠান শূণ্য মাচা
শূণ্য ভাঁড়ার ঘর ;
এমন দিনে বাছা রে তোর
এ কোন্ কঠিন জ্বর ?

এর ঝাঁটা ওর লাথি থেয়ে
বেড়েছি তুই ছেলে ;
বাঁচবি কি তুই এই জ্বরেও
উপোসে দিন গেলে ?

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর...
আমি কি তোর মা ?
চোখের জলে ঘর ভেসে যায়
তাপ তো কমে না ।

ক্ষুধার আগুন দাউ দাউ দাউ
কান্না-ভেজা ঘরে ;
মায়ের কোলে দুধের শিশু
দুধ ছাড়া আজ মরে ।

বাইরে বাতাস আছড়ে পড়ে...
আমি কি তোর মা ?
ঝাঁটা সইলাম, লাথি সইলাম
কী-জন্মে সোনা !

রুটি যখন অনেক দূর

রুটি যখন অনেক দূর, নীল আকাশের চাঁদ

সোনা, তুই জন্মালি এই দেশে ।

ওরে মাণিক পরাগ ভ'রে রুটির জন্তু কাঁদ ;

নয়নে রুটির আলো, তবে তুই স্বপ্নে ওঠ হেসে !

শিক্ষক ধর্মঘট

ধনে ধাত্রে পুষ্পে ভরা উজ্জল স্বদেশ

সতেরো বছর

স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা

সতেরো বছর

পবিত্র স্বদেশ, সকল দেশের সেরা

সতেরো বছর

স্বাধীন স্বদেশ :

ঘর জলে, পেট জলে, রাজপথ জলে

অন্নহীন মানুষের উপবাসে, উলঙ্গের হাহাকারে

মার খাওয়া রক্তাক্ত মিছিলে ।

একটি আত্মার শপথ

[ভাতৃহত্যার প্রতিরোধকালে নিহত আমীর হোসেন চৌধুরীর স্মৃতিতে নিবেদিত]

‘মরতে জানা যত সহজ

মরতে জানা তত সহজ নয় ?

তাই কি ভাবিস, তাই কি দেখাস ভয় !

‘এইটুকু তো বুকের মণি

তাকেই আবার টুকরো করা চাই ?

ভুলেই গেছিস ওরা আমার ভাই !

‘মরতে জানা সত্যি সহজ,
মরতে জানা আরো সহজ যে—
নে রে মূর্খ আমার জীবন নে !’

এই বলে সে চলে গেল, রক্তে-ভাসা বুকের মণি তার
কাঁপিয়ে দিল বুড়িগঙ্গার ভাগীরথীর পাখান অঙ্ককার ।

মানুষ

তার ঘর পুড়ে গেছে
অকাল অনলে ;
তার মন ভেসে গেছে
প্রলয়ের জলে ।

তবু সে এখনো মুখ
দেখে চম্‌কায়,
এখনো সে মাটি পেলে
প্রতিমা বানায় ।

মহাদেবের ছয়ার

১৫

এক এক বছর যেন চোখের জলের
পিছল সমুদ্র যায়
হাহাকারে, প্রলয়ে, তুফানে, শূন্য ভবিষ্যতে

নদীগুলি ভয়ানক শুষ্ক, পিপাসায়
কাছে গেলে ধমকে, গর্জনে
চক্ষু লাল করে ।

স্বাধীন স্বদেশে ঘরে ঘরে
শোনা যায় আদিঅস্তহীন, দিগন্তচিহ্নহীন মৃত্যুর গর্জন !

২৫

অন্ধকারে দেখা যায় না
তবু
অনুভব করা যায়
চোখের জলের নদী প্রবাহিত
এইখানে ।

পরিত্যক্ত মৃতদেহগুলি
হঠাৎ বাতাসে
কৈপে গুঠে, আর
শূন্য বেহুলার ভেলা ভেসে যায়
নরকের দিকে, দারুণ দুর্ভিক্ষে,
অসহায় ।

৩৮

র'য়েছে বুকের মধ্যে তোর নাম
রক্তের সমুদ্রে শুয়ে
মাঝে মধ্যে ভীষণ তোলপাড় হয়
তারপর অসম্ভব শান্ত, যেন স্থির ছবি ।

কখনো দু'চোখ ভ'রে ঘুম নামে
তোর স্মৃতি ক্রমেই অম্পষ্ট হয়, মুছে যায়
ছেড়ে আসা সমুদ্রের অতিদূর চোখের জলের মতো !

আর কতোকাল তুই এইভাবে ভাসতে থাকবি
রক্তের ওপর, লবণাক্ত, সহোদর !

৪০

চোখের জলের সাগর
হিম সাগর

কেন বিষের লবণে জলিস
ভূষণ ঢেকে !

বুকের মধ্যে থেকে থেকে
মাপের ছোবল,
টেউগুলি আছড়ায় ;
কোথায় যেন নরখাদক ক্ষুধায় আকাশ ছেঁড়ে !

অনেক দূরে মাটির দেশ, স্বপ্নের চাষীরা
সেখানে বীজ বোনে,
ভালবাসার শিশুরা গান গায়...
অনেক দূরে !

রম্যা রঙ্গা : মানুষের নাম

নিরম্মের দেশে, উলঙ্গের দেশে, নিরাশ্রয় মানুষেরা হাত-পা-ভাঙা, বোবা,
মুখে রক্ত তোলে আর দীর্ঘশ্বাস ঘরে ঘরে ; আর শ্মশানের শাস্তি, আর
স্বাধীনতা দানবের, পশুর, মাপের ভয়ঙ্কর স্পর্ধা, ভয়ঙ্কর মৃত্যুর গর্জন !

সকলেই বিকলাঙ্গ, নষ্ট, ক্রীতদাস, সকলেই নতজানু রক্তচক্ষু কুকুরের
আক্ষালনে, এমন কি কবি আজ বেঞ্জার সমান, নতজানু ; অন্ধকার দেশে
আমরা সবাই পলাতক নেড়িকুত্তা, দূর থেকে লেজ নাড়ি আর দয়া তিনকা চাই
ইতর মজীর কাছে, তার পোষা সর্দারের কাছে ; নতজানু, আমরা কর্তব্য
শিখি—স্বদেশের নিরাপত্তা, গণতন্ত্র, পবিত্র সংবিধান, আইন, স্বাধীনতা,
স্বদেশের নিরাপত্তা, স্বদেশের...নিরম্মের দেশে, উলঙ্গের দেশে ।

সত্যিকারের মানুষের নাম আমাদের মুখে আজ মানায় না, যে মানুষ প্রাণ
থাকতে মাথা নত করেনি পশুর, দানবের রক্তচক্ষু দেখে ; বরং জীবন দিলে
গেছে ।

[সংক্ষেপিত]

মে দিন ১৯৬৫

আয় কালবৈশাখী হাওয়া, উড়িয়ে নে
তুকনো আবর্জনা, ধুলো, মৃত্যু, অপমান !
আন বুকে স্পর্ধা, কণ্ঠে জীবনের গান
অন্ধ, বোবা আমার স্বদেশে !

চারদিকের ক্রান্তির শব্দ, শুধু পাতা ঝরে
আর অন্ধকার, আর গভীর কুয়াশা ;
আর মার-থাওয়া স্বপ্ন, রুগ্ন প্রেম, শীর্ণ ভালবাসা
মুখে রক্ত তুলে মাথা তুলতে চায়, ফিরে মার খায়, ফিরে রক্তবমি করে !

আয় কালবৈশাখী হাওয়া, ঝড় আন
বুকের ভিতর, ভারতবর্ষকে দেখি অশ্রুভাবে, শপথে আলোকে ।
কে আর অনন্ত কাল পুষে রাখে, পুড়ে যায় শোকে ?
চারদিকে নবজন্ম, দেশে দেশে শব্দ বাজে, শোন । যায় মানুষের গান ॥

ভিয়েতনাম : ভারতবর্ষ

অন্ধকার আমার স্বদেশে
নিরস্ত্রের উলঙ্গের হাহাকার
আর উন্মাদের অস্থির হাসির শব্দ ছাড়া
অন্য কোনো শব্দ নেই ।

এ সময়ে কোথায় মানুষ মাথা উঁচু ক'রে
পথ হাঁটে, মাথা উঁচু রাখতে হবে ব'লে
পশুর দাঁতে ও নখে ছিঁড়ে যেতে যেতে
জলে ওঠে পবিত্র স্থণায়,
কিছুই বুকের মধ্যে অমৃতব হয় না ।

আমার ঘরেও আজ মৈরিজ্বী বাধে না চুপ
কিন্তু আমি দীর্ঘদিন বিরাট রাজার নাচঘরে
নগ্নমক, নাচ শেখাই, আর যন্ত্রণায় জলি
আর ভেসে আসে শব্দ—
নিরন্তর উলঙ্গের হাহাকার, উন্মাদের হাসি ॥

লেনিন

যে দেশে শিশু জন্ম নিলে
জননীর মুখের হাসি মানিক হয়ে বারে
যে দেশে শিশু জন্ম নিলে
পঙ্কজীদের প্রতি ঘরে শাঁখ বাজে, এয়োতিরো উলু দেয়
সে দেশের একটি মানুষ অনেকদিন কবরের নিচে শুয়ে আছেন
কিন্তু তিনি কখনো ঘুমোন না, পাহারা দেন
যেন কোনো জননীর মুখের হাসি চোখের জল না হয় ।

আমার ভারতবর্ষ

আমার ভারতবর্ষ
পঞ্চাশ কোটি নগ্ন মানুষের
যারা সারাদিন রোদে খাটে, সারারাত ঘুমতে পারে না
ক্ষুধার জালায়, শীতে ।

কত রাজা আসে যায় ইতিহাসে, দৈর্ঘ্য আর ঘেব
আকাশ বিধাক্ত করে
জল কালো করে, বাতাস ধোঁয়ায় কুয়াশায়
ক্রমে অন্ধকার হয় !

চারদিকে ষড়যন্ত্র, চারদিকে লোভীর প্রলাপ
 যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ আসে পরম্পরের মুখে চুমু খেতে খেতে
 মাটি কাঁপে মাপের ছোবলে, বাঘের খাবার !

আমার ভারতবর্ষ চেনেনা তাদের
 মানেনা তাদের পরোয়ানা ;
 তার সম্মানেরা ক্ষুধার জালায়, শীতে চারদিকের প্রচণ্ড মারের মধ্যে
 আজও ঈশ্বরের শিশু, পরম্পরের সহোদর ।

তেরো নদীর জল

স্বপ্নে আমি দেখেছিলাম তাকে
 মাটির সরায় আঁকা আমার মা
 মাথার ওপর কোজাগরীর আলো
 পায়ের পদ্মে জলের যন্ত্রণা ।

অসহ্য এক চেতনার উন্মাদ
 আদেশ ক'রল, ঠুকে প্রণাম কর !
 আমি বললাম, ও-যে আমার মা—
 আমার এখন সারা অঙ্গে জ্বর !

কোলের ওপর লুটিয়ে দিলাম মাথা ।
 মা গো, কোথায় শান্তি কোথায় সুখ ?
 দেখিস নে তুই অনাহারের জ্বালা
 চোখ চাইতে কাঁপে না তোর বুক ?

স্বপ্ন ভাঙল ; তেরো নদীর জলে
 বুক ডুবিয়ে ক্ষুধার মিছিল চলে ।

ভারতবর্ষ

মণি, আমার মণি
 কেন রে তুই কাতর ?
 কপালে দিই চুমা
 এবার মণি ঘুমা ;
 স্বাধীন হ'তে বুক করেছি পাথর ।

মণি, আমার মণি
 ক'দিন উপবাসী ?
 জ্বরে পুড়ছে গা
 চুমায় সারে না ;
 স্বাধীন দেশে চোখের জল-ও বাসি ।

কেবল খোঁজে এক মূঠো ভাত

এই যদি রে ফুল ফুটেছে
 এই যদি রে নীলকণ্ঠ পাখি
 আলোর মুখ তুলেছে, ভালবাসার আবীরে
 গাছের ছায়ায় নদীর জলে ভরেছে তিন ভুবন ;
 এই যদি রে তুষার গলে, পাহাড়ে শান্ত সম্মোহন
 করুণাধারা, চোখের জল...

কিন্তু তার শুক চোখ, ফুল দেখে না, নদী দেখে না
 ভালবাসার আবীরে আর রাঙে না রে ;
 কেবল খোঁজে এক মূঠো ভাত, এক মূঠো ভাত, এক মূঠো ভাত !

জন্মদিন

(অক্টোবরের দিনগুলি মনে রেখে)

মাতৃশ্বের মুখের ওপর

আলো পড়ে, চোখের জলের স্নান স্বপ্নগুলি

প্রত্যাশায় কৈপে ওঠে, মনে হয় বৃক্ষের পুরানো ক্ষতচিহ্ন, ঘানি

এইবার রৌদ্রে ধুয়ে যাবে, নব কিশলয়ে বৃক্ষের বাহার

অমল আশ্রয় দেবে সব মাতৃশ্বের স্বপ্নের কান্নাকে ।

একি শুধু দিবাস্বপ্ন ? অর্ধশতবর্ষ ধ'রে এই শঙ্করানি

ঘরে ঘরে একটিই শপথ, জন্মদিনের প্রত্যাশের অবাক স্বপ্নগুলি

উচ্চারিত হ'য়ে যায়, তবু মাতৃশ্বের বৃক্ষের ভিতর বিষ হয়, মুখে রক্ত ওঠে

রৌদ্র চলে গেলে ; দেখি পত্রহীন পুষ্পহীন বৃক্ষের শাখায়

শীতের প্রচণ্ড স্পর্ধা !

কোনো আলো স্থির নয়, কোনো ভালবাসা ঘানিমুক্ত নয়...

কোনো বৃক্ষ চিরহরিৎ প্রার্থনা নিয়ে ঈশ্বরের সমান উদাত্ত নয় ?

চোখের সামনে ভোর, জন্মদিন তবে শুধু

অনুষ্ঠান, কবির বাহবা !

ভাল ক'রে কিছুই জানি না, আমি অদীক্ষিত কবিরাজ, সভা নয়,

শুধুই প্রার্থনা জানি

আর জানি, অন্ধকার ধুয়ে দিতে বৃক্ষের মধ্যে যেই গান জাগে—

বারবার ঢেকে যায় শব্দহীন কুয়াশায়, অসহায়, নিয়তি আমার !

উত্তরপাড়া কলেজ : হাসপাতাল

রক্ত রক্ত শুধু রক্ত, দেখতে দেখতে ছুই চোখ অন্ধ হয়ে যায়

শিক্ষক ছাত্রের রক্ত প্রতিটি সিঁড়িতে, ঘরে, চেয়ারে, চৌকাঠে বারান্দায় !

দরজা ভাঙ্গা, জানলা ভাঙ্গা, ছাতের কাণিশ ভাঙ্গা, আহত ছাত্রের

মাথা ঠুকে ঠুকে তারা খসিয়েছে ইট সুরকি ! রক্তাক্ত মাথায়

নির্ধাচিত কবিতা

কেউ লাফ দিয়েছে বিশ ফুট নীচে, কাউকে ছুঁড়ে দিয়েছে পুলিশ ;
রক্তবমি করে আজ হাসপাতালে এই বাংলার কিশোর গোড়ায় !

এই তোমার রাজত্ব, খুনী ! তার ওপর কি বাহবা চাও ?
আমরাও দেখব, তুমি কতদিন এইভাবে রাজস নাচাও !

বাছা আমার

বাছা আমার
গিরগিটির ছা ;
যখন যেমন
রঙ বদলায় ।

এই মাঠে, ঐ
মাচায় উঠে
রামধুন গায় ।

সোনা আমার
পারলে কিন্তু
মাহুঘও খায় ।

কার মুখ দেখে ভোর হবে,
ডিসেম্বর ? কোন ঘোষ অথবা সেনের ?
ঘোষ তো অনেক ;
আর সেন ?

সেখানেও উপস্থিত আমাদের প্রাক্তন আরেকজন,
কুলীন বজ্রাল ! পেছনে ঘুপটি ঘেরে যায় রাজবল্লভ ;
মাঝে মধ্যে ঘোমটার আড়াল দিয়ে কলকাতা থেকে দিল্লী
পুনরায় দিল্লী থেকে কলকাতা !

তুমি কার মুখ দেখে উঠবে হে ।

এদিকে সমস্ত বাংলা দেশ জুড়ে
ফড়ে আর বেণ্ডাদের নাচ ! নাচে সেন-ঘোষেদের
পিতৃতুল্য শেঠজী আগরওয়াল
আর নাচে হুমায়ুন ধর্মবাপের খেতপাথরের বৈঠকখানায় ।
নাচতে নাচতে সকলেই সোনার বাংলার বস্ত্র কাড়ে, তাকে
সম্পূর্ণ উলঙ্গ ক'রে মজা দেখে
আর উন্মাদ জগাই মাধাই, দুই ভাই,
হাসতে হাসতে গড়াগড়ি যায়
নিজেদের বাহবায় !

তুমি কি এদেরই মুখ দেখে আজ ভোরবেলাকে
নরকের মতো জানবে, ডিসেম্বর ? নাকি নরপশুদের বাহবা ছাড়িয়ে
উর্ধ্ব আন্দোলিত

ঐ টকটকে নিশান
মানুষের রক্ত লাগা, হাজার ছাত্রের খুনে লাল, সাতরাজার ধন এক মানিক
বুকের মধ্যে নিয়ে, যায় যাবে জীবন ব'লে বাংলার নভেম্বরের লজ্জা ঝেড়ে কেনে
চৌমাথার মোড়ে এসে দাঁড়াবে নির্জন !...চারদিকে নক্ষত্র ধ্যানাসীন
একটি সূর্যের স্তবে । জয় হবে । নতুন জন্মের । মানুষের ।

[সংশোধিত]

জেলখানার কবিতা

একজন কিশোর ছিল, একেবারে একা
আরও একজন ক্রমে বন্ধু হল তার ।
দু'য়ে মিলে একদিন গেল কারাগারে ;
গিয়ে দেখে তারাই তো কয়েক হাজার

জল দাও

দিছি ভর্তি জল, সত্যিকারের জল
গাছের পাতায় সত্যিকারের হাওয়া ;
তুমি মন্ত্র জানো ।

কত দিন যে জল দেখি নি, রোদ দেখিনি —
মাথার ওপর সত্যিকারের সূর্য ওঠা !

কত দিন যে বৃকের মধ্যে বাতাস মানে শুধুই বিষ,
কত দিন যে নরকবাস হ'লো ! তুমি সত্যি ক'রে বলো,
বাংলা দেশের পুকুর আবার জলে ভ'রবে ?
রোদে হাসবে আকাশ ?

নাকি ম্যাজিক, শুধুই ম্যাজিক, শুধুই চোখের জল !

দেয়াল

সম্পূর্ণ আকাশটাকে ঘিরে ফেলছে
হাজার শকুন
যেখানে ঝরেছে খুন, ঝাঁপিয়ে পড়ছে তারা

মাঝখানে দেয়াল

এদিকে আগুন জ'লছে, মুখ দেখছে নিশি-পাওয়া এক লক্ষ মানুষ

গোপিকার জন্য

প্রতিটি রুটির টুকরো রক্ত মাথা
 প্রতিটি ধানের শিষ, গোলাপ, রজনীগন্ধা, সব এক রকম ।
 এমন কি কুয়াশার মুখগুলি দেখি যত সভায়, মিছিলে
 আজ রক্তচন্দনের শোভা ।...গনগনে উঠুনে সৈঁকা,
 আগুনের চেয়েও গরম
 মেঘ নাচে আকাশে, লালে লাল, দেখি এ কোন বিহান !
 প্রতিটি রুটির টুকরো, প্রতিটি ধানের শিষ জলে যেন
 ফিনকি দেওয়া খুনের নিশান ।

২৯ নভেম্বর, ১৯৬৭

লাল টুকটুক নিশান ছিল

লাল টুকটুক নিশান ছিল
 হঠাৎ দেখি, শ্বেত কবুতর
 উড়ছে উর্ধ্বে, আরও উর্ধ্বে
 ভূখ মিছিলের মাথার ওপর ।

বিপ্লব হোক দীর্ঘজীবী,
 কিন্তু এখন ‘শান্তি, শান্তি ।’
 প্রেতের মতো ধুঁকছে মিছিল
 উড়ছে পায়রা নধরকান্তি ।

জেলখানার কবিতা ২

এক

পায়রাগুলি বকম বকম করে
 চুড়ুই বসে ভাতের থালায় একটু দূরে ;

নির্বাচিত কবিতা

হলো বেড়াল, শিশু বেড়াল উগুড় হয়ে বসে
প্রতীক্ষায় থাকে ।

বারো নম্বর ওয়ার্ডে সবাই খেতে বসেছে ;
চারদিকে তার রৌদ্রের উৎসব ।

দুই

খুনী কি কখনো রাত জাগে
একা

যখন চারদিকে মহা নৈঃশব্দ, মহৎ শাস্তি
ভধু তারই হাত
রক্তমাখা !

খুনী কি কখনো ধুয়ে দিতে পারে
হাত থেকে তার
শিশুর, ছাত্রের, জননীর রক্ত
স্বদেশের হীন অপমানে ?

নাকি সারারাত
অঘোরে ঘুমায় হত্যাকারী
নিশ্চিন্ত নরকে !

তিন

ক'টা বাজল ? গেটের সামনে
এখনো পাহারা ! কালো মুখ করে
সেপাই দাঁড়িয়ে আছে । সূপ্রভাত !
ক'টা বাজল মশাই হে ? এদিকে অনেকক্ষণ
দুর্ঘ উঠে গেছে !

গেট খুলে গেলে আমরা একটু আধটু রোদ পাব
যদিও গেটের বাইরে গেট, পথ হাটলে

আবার লোহার দরজা ! ডাইনে বায়ে ভয়ঙ্কর অপরাধী,
মিশতে বারণ ।...

তবু গেট খুলে যাওয়া ভাল ; বাইরে একটু পায়চারি করা যাবে

মশাই হে ! রাস্তায় হাঁটবার গেট খুলে দাও ।

চার

জৈনকের জন্মদিনে

কারার আড়ালে জন্মদিন

বাজায় ভোরের শঙ্খ ?

তোমার, আমার, পৃথিবীর

সব মানুষের

মুখের ওপর এই ভোর

কাপে না কি ?

আমরা তো স্বপ্ন দেখি

স্বদেশের প্রতি ঘরে একটি জন্মদিন

আলিপুর সেন্ট্রাল জেল

৩০-৩১ ডিসেম্বর, ১৯৬৭

উল্ঙ্গের স্বদেশ

The proletariat has nothing to lose but his chain.

—Communist Manifesto

এক অদ্ভুত মাটির ওপর

আমরা দাঁড়িয়ে আছি ;

অথাৎ দাঁড়িয়ে থাকার জন্ত

প্রাণপণ চেষ্টা করছি ।

এ মাটির গর্ভে কী আছে

আজও আমাদের জানা নেই ;

নির্বাচিত কবিতা

যদিও কান পাতলে শুনতে পাওয়া যায়
এক লক্ষ সাপের গর্জনের চেয়েও
কোন ভয়ঙ্কর পরিণাম, যা ক্রমেই আসন্ন হচ্ছে ।

কিন্তু আমরা এক পাও এদিক ওদিক
নড়ছি না ; যেন স্থির দাঁড়িয়ে থাকাই
আমাদের নিরাপত্তা, এবং তা সম্ভব । আমরা গির্জার গম্বুজগুলির
এবং স্টক এক্সচেঞ্জের চারদিকের বিরাট স্তম্ভগুলির দিকে
বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থেকে
এক সময় ঈশ্বরের মহিমাকে জানতে পারছি
আর এই কথা ভেবে নিশ্চিত হচ্ছি,
আমাদের স্বদেশ স্বাধীন এবং তার সীমান্তে
বন্দুকধারী প্রহরীরা প্রত্যহ টহল দিচ্ছে ।

যদিও পায়ের নিচে মাটি এখন অগ্নিগর্ভ ;
যদিও আমাদের মাথার ওপর আকাশ বলতে কিছুই নেই ।

জন্মভূমি

তিমিরবিনাশী তুই, জন্মভূমি ।
মেলান বৃকের পদ, দিঘির কান্নাকে
শিশুর মুখের রোদ্রে, শান্ত
উষার আগুনে ।

রাত্রি ভোর হয় -
পদ্মের পাতায়, জলে । মঙ্গুগুলি
অবাক ভোরের পাখি, আর
আগুনের রঙে রাঙা মাহুঘের শোক ! জন্মভূমি,
তোর পায়ে মাথা রাখতে সাধ হয় ।

তোমার পায়ে মাথা রেখে জেগে উঠতে সাধ হয়
 ফুলের, ফলের ;
 সবুজ শস্যের গানে ধানক্ষেতগুলি
 বুকের বসন খুলে ডাক দেয় পৃথিবীর কালো সাদা হলুদ শিশুকে ।
 তুই তিমির-বিনাশী ! তাই কুরুক্ষেত্রে প্রতিটি রক্তের ফোঁটা
 এমন নির্মল !

কোজাগর পূর্ণিমা

তরাই থেকে দার্জিলিং
 কোজাগরের আলোয় আলো
 বাংলা দেশ

কোথাও নেই একটি ফুল
 আশ্বিনের ; কোথাও নেই
 আঙিনা জুড়ে লক্ষ্মীর পা ;
 শুধু শ্মশান !

দেয়ালের লেখা

দেয়ালের লেখাগুলিকে
 কারা যেন মুছে দিতে চাইছে ।
 কারা যেন
 বত্রিশ সিংহাসনের প্রচণ্ড স্পর্ধায় চক্ষু লাল ক'রে
 নির্দেশ দিচ্ছে : 'এবার থামো ;
 এখন থেকে বিপ্লব আমাদের হুকুম মেনে চলবে' ।

একবার সিংহাসনে উঠে বসতে পারলে
 তখন দেয়ালের লেখাগুলি অশ্লীল প্রলাপের মতো মনে হয় ।

তখন অপরের পোস্টার ছেঁড়াই শ্রেণী-সংগ্রামের কাজ ;
 অথবা ডজনখানেক মন্ত্রী জড়ো ক'রে রাস্তায় বক্তৃতা দেওয়া :
 'সাবধান ! যারা দেয়ালকে কলঙ্কিত করছে ! তোমাদের পেছনে
 এবার গুলি লেলিয়ে দেব ।'

তারা বত্রিশ সিংহাসনের আশ্চর্য মহিমায়
 এখন থেকে বাংলা দেশের তামাম দেয়ালগুলোকে
 নতুন করে চুনকাম ক'রে দেবে, যেন কোথাও কোনো
 গুলি খাওয়া মানুষের রক্ত
 ছিটে ফোঁটাও দাগ না রাখে ।

ভিক্ষার মিছিল যায়

আসমান ছেয়ে গেছে
 পতাকায়, ফেঁটুনে, গর্জনে;
 মনে হয় দৃশ্যের দর্পণে
 বুঝি দ্রুত পৃথিবী বদলায়—

কুয়াশায়
 ও শুধু চোখের ভুল । যা দেখিস,
 ভিক্ষার মিছিল যায় ।

রক্তাক্ত মুখোশ

সবুজ গাছের পাতাগুলি
 বারুদের গন্ধে, খোঁড়া সিংহের গর্জনে
 বমি করে
 রক্তাক্ত মানুষের অভিশাপ ;

মাটি

লাল হয় হাজার হাজার গভিণীর
জ্বলের চিংকারে...

বোবা

সূর্য ওঠে প্রকাণ্ড পতাকা

উড়িয়ে ;

আফ্রিকা

যথের ধনের মতো আগলায়

রক্তাক্ত মুখোশ ।

জেলখানার ডায়েরী / হো চি মিন

(অংশ)

খাড়া পর্বত ভেঙে আমি পাহাড়গুলির চূড়ায় উঠেছি ।

কী করে বুঝব, তরাইয়ে আরো বিপদ অপেক্ষা করছে ?

পাহাড়ে বাঘের মুখোমুখি হয়েছি, গায়ে আঁচড়টিও লাগে নি ;

মুক্ত প্রান্তরে এসে দেখা হ'ল মানুষের সঙ্গে, আব তরাই

আমাকে ছুঁড়ে দিল একটা জেলখানায় !

জেলখানায় পুরণো বাসিন্দারা নতুন কয়েদীদের অভ্যর্থনা জানায় ।

আকাশে সাদা মেঘেরা কালোদের পিছু-ধাওয়া ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছে ।

সাদা মেঘ, কালো মেঘ, সবাই আমাদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায় ।

নিচে, পৃথিবীতে, স্বাধীন মানুষদের ঠেসে জেলখানায় ভরতি করা হচ্ছে !

রোজ ভোরবেলায় বাইরের দেয়াল বেয়ে সূর্য ওঠে,

ফটকের ওপর তার উজ্জ্বল রশ্মি ছুঁড়তে থাকে ; কিন্তু ফটক

একই রকম তালাবদ্ধ ।

জেলখানায় করেদীদের ঘরগুলি গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন !
কিন্তু আমরা জানি, বাইরে উদয়-সূর্য আলোর হাট বসিয়েছে ।

রাত দশটায় পাহাড়চূড়ায় সমাসীন কালপুরুষ
ঝাঁঝীদের গান কড়ি ও কোমলে রচে আশ্বিন-স্তোত্র ।
বাইরে ঋতুর পরিবর্তনে কিবা আসে-যায় বন্দীর
সে শুধু একটি স্বপ্নই দেখে, কোন দিন হবে মুক্ত ।

নিহত কবির উদ্দেশে

যারা এই শতাব্দীর রক্ত আর ক্লেশ নিয়ে খেলা করে
সেইসব কালের জল্লাদ
তোমাকে পশুর মত বধ ক'রে আহ্লাদিত ?
নাকি স্বদেশের নিরাপত্তা চায় কবির হৃৎপিণ্ড ?

তবে শাস্তি ! কার শাস্তি ? হাজার কুকুর ঘোরে
হুভিক্ষের নবাবী বাংলায়
গান গায় দরবারী কানাড়া, লেখে পোশাকী কবিতা—

তুমি মৃত ! বহুদিন কবিতা লেখ নি । বহুদিন
পরিচ্ছন্ন পোশাক পরো নি ; ঘুরেছ উন্মাদ হ'য়ে
উলঙ্গের, নিরস্ত্রের দেশে—তাই মৃত—তুমি পোশাক ছেড়েছো

তার অপরাধ.

আজও খুনী হেঁটে যায়

আজও খুনী হেঁটে যায় প্রত্যেকের চোখের সামনে
মায়ের চোখের জলে, শিশুর লোহতে ভাসা আমার স্বদেশে

কেউ নেই তাকে প্রণয় করে, কেউ নেই প্রকাশ্য রাস্তায় তার কাঁধে
হাত রেখে বলে, 'তোমার বিচার হবে।'
কেউ নেই তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘণায় ক্রোধে জলে ওঠে।

সকলেই যে যার অন্তরে বসে তার জন্ত নিরাপদ নিন্দার বাহবা
ছুঁড়ে দেয় ; কিংবা সভা ক'রে তার নামে নিজেরা উজ্জল হয়।

কেউ নেই মাতাল গুণ্ডার মুখ থেকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলে দেয়
রাজার মুখোশ ; যখন শ্মশানে হরিধ্বনি ভেসে আসে আর শিশুর মুখের ওপর
স্থির হয় উর্ধ্ব সপ্তর্ষির, কালপুরুষের একটিই প্রতীক্ষা।

সকলেই চিতার আগুন নিভিয়ে কলসীর জলে
ঘরে ফেরে, ভোরবেলার কাগজে দেখবে ব'লে মৌন-মিছিলের ছবি।

গুলি চলছে

গুলি চলছে, গুলি চলছে, গুলি চলবে—এই না হলে শাসন ?
ভাত চাইতে গুলি, মিছিল করলে গুলি, বাংলা বন্ধ
গুলির মুখে উড়িয়ে দেওয়া চাই !
দেশের মানুষ না খেয়ে দেয় ট্যাক্স, গুলি কিনতে, পুলিশ ভাড়া করতে,
গুণ্ডা পুষতে ফুরিয়ে যায় তাই।
একেই বলে গণতন্ত্র ; এরই জন্ত কবিতার সর্দার সাহিত্যের মোড়লেরা
কৈদে ভাসান ; যখন
গুলিবিক্র রক্তে ভাসে আমার ঘরের বোন, আমার ভাই !

জন্মভূমি আজ

একবার মাটির দিকে তাকাও
একবার মানুষের দিকে।

এখনো রাত শেষ হয়নি ;
 অন্ধকার এখনো তোমার বুকের ওপর
 কঠিন পাথরের মতো, তুমি নিশ্বাস নিতে পারছো না ।
 মাথার ওপর একটা ভয়ঙ্কর কালো আকাশ
 এখনো বাঘের মতো থাবা উচিয়ে বসে আছে ।
 তুমি যে ভাবে পারো এই পাথরটাকে সরিয়ে দাও
 আর আকাশের ভয়ঙ্করকে শান্ত গলায় এই কথাটা জানিয়ে দাও—
 তুমি ভয় পাওনি ।

মাটি তো আগুনের মতো হবেই
 যদি তুমি ফসল ফলাতে না জানো
 যদি তুমি বৃষ্টি আনার মন্ত্র ভুলে যাও
 তোমার স্বদেশ তাহলে মরুভূমি ।
 যে মানুষ গান গাইতে জানে না
 যখন প্রলয় আসে, সে বোবা ও অন্ধ হয়ে যায় ।
 তুমি মাটির দিকে তাকাও, মাটি প্রতীক্ষা করছে ;
 তুমি মানুষের হাত ধরো, সে কিছু বলতে চায় ।

আমার সন্তান যাক প্রত্যহ নরকে
 আমার সন্তান যাক প্রত্যহ নরকে
 ছিঁড়ুক সর্বাঙ্গ তার ভাড়াটে জল্লাদ ;
 উপড়ে নিক চক্ষু, জিহ্বা দিবা-দ্বিপ্রহরে
 নিশাচর স্বাপদেরা ; করুক আহ্লাদ
 তার শৃঙ্খলিত ছিন্নভিন্ন হাত-পা নিয়ে
 শব্দনেরা । কতটুকু আসে-যায় তাতে
 আমার, যে আমি করি প্রত্যহ প্রার্থনা,
 ‘তোমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে ।’

যে আমি তোমার দাস ; কানাকড়ি দিয়ে
 কিনেছ আমাকে রানী, বেঁধেছ শৃঙ্খলে
 আমার বিবেক, লজ্জা ; যে আমি বাংলার
 নেতা, কবি, সাংবাদিক, রাত গভীর হ'লে
 গোপনে নিজের সন্তানের ছিন্ন শির
 ভেট দিই দিল্লীকে ; গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে
 ভোর বেলা বুক চাপড়ে কেঁদে উঠি, 'হায়,
 আত্মঘাতী শিশুগুলি রক্তে আছে শুয়ে !'

আমার সর্বাঙ্গ জলে আশ্রয় চুমায়
 তোমারই দান্ধিয়া, রানী, দিয়েছ নিভূতে ;
 এবার পাঠিয়ে দাও প্রকাশে ঘাতক,
 বাগানে যে-ক'টি ফুল আছে ছিঁড়ে নিতে ।
 প্রত্যেক কাগজে আমি লিখবো ফুলের
 ভেতরে পোকার নিন্দা, খুনীর বাহবা
 প্রত্যহ বাংলার শিশু-গোলাপ ক'টির
 সর্বনাশে সরগরম করবো আমি সভা ।

আমার সন্তান যাক প্রত্যহ নরকে
 ছিঁড়ুক সর্বাঙ্গ তার ভাড়াটে জল্লাদ,
 উপড়ে নিক চক্ষু, জিহ্বা দিবা-দ্বিপ্রহরে
 নিশাচর শ্বাপদেয়া, করুক আহ্লাদ
 তার শৃঙ্খলিত ছিন্নভিন্ন হাত-পা নিয়ে
 শকুনেরা । কতটুকু আসে-যায় তাতে
 আমার, যে আমি করি প্রত্যহ প্রার্থনা,
 'তোমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে ।'

স্বদেশ প্রেমের দীপ্ত মহিমায়

'I smell dark police in the trees'.

কে তুমি হে ! দেবদারু বীধিতেও গন্ধ পাও কালো পুলিশের ?

তোমার অসীম স্পর্ধা ! জাননা কি এখন স্বদেশ

ভিতরে বাহিরে নিষ্প্রদীপ, তার বাতাসে বিষের ধোঁয়া...

কে তাকে বাঁচাতে পারে যদি না পুলিশ চালে বৃক্ষের শিকড়ে গ্যালন গ্যালন রক্ত ?

কার রক্ত—নির্বোধের মত প্রস্রাব কর তুমি । দুধ কলা দিয়ে পোষা

সাপ তারা । দেবশিশু তোমার চোখের ভ্রম ! ওরা কেউ শিশু নয়, জানে

তা পুলিশ, জানে দিল্লীর ঈশ্বরী ।

তুমি অন্ধ ! তাই গাছের পাতায় কালো ছায়া দেখ, গোলাপেও পুলিশের

গন্ধ পাও, যে স্রবাস পবিত্র, নিহত পশুর রক্ত । যার চোখ আছে, দেখে

কলকাতায় পার্কে ময়দানে রাজভবনে অথবা এঁদো গলির

বস্তির মুখ আলো ক'রে

যেখানে যা বৃক্ষ আছে, ঈশ্বর-প্রতিম তারা, স্বদেশ-প্রেমের দীপ্ত মহিমায়

জলে যেন ত্রিবর্ণ পতাকা !

মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চীৎকার করে

'The earth is filled with mercy of god.'

অসীম করুণা তার, ঐ বধ্য-মঞ্চ, যাকে বলি মাতৃভূমি ;

জল্লাদেরা প্রেম বিলায় কোলের শিশুকে, তাঁর সীলা !

কবিরা কবিতা লেখে, দেশপ্রেম, ক্রমে গাঢ়তর হয় গর্ভের ভিতর রক্তপাত—

মুণ্ডহীন ধড়গুলি আহ্লাদে চিৎকার করে, 'রক্তিলা ! রক্তিলা !

কী খেলা খেলিস তুই !'

যজ্ঞগায় বসুমতী ধনুকের মত বেঁকে যায়—

বাজারে মহান নেতা ফেরি করে কার্ল মার্কস লেলিন স্টালিন গান্ধী

এক এক পরসায়...

যা লেখ কবিতা লেখ

যা লেখ যা ইচ্ছে লেখ কিন্তু খবরদার, দিওনা সাপের লেজে পা ;
ব'লো না, নরখাদক বাঘ মানুষের মাংস খায়—

যা লেখ কবিতা লেখ কিন্তু কে তোমার মাথায় দিয়েছে দিবিয়া, যা
কদাচ প্রকাশ্য নয়, এ ভর-সঙ্কায়, এই কাল বেলায়
করতে হবে উচ্চারণ ? দেশের আদংকালে এ সকল

গোয়াতু'মি ছাড় হে, যা লেখ, ইচ্ছেমত লেখ ;

বদলেয়ার ভেঙে খাও, স্বপ্নে দেখে নাজিম হিকমত

অনুবাদ করো পাবলো নেরুদা

কিন্তু সাবধান ! যদি আন্ বাড়ি যাও, যদি নিষিদ্ধ রক্তের

দিকে তুল করে তাকাও, বলো

তোমার স্বদেশ বধ্যভূমি, দেশপ্রেম হাজার শিশুর রক্ত...

তোমাকে বাঁচাবে, মর্তে জন্মেনি সে অলীক দেবতা !

তুই

তোর কি কোনো তুলনা হয়

তুই

চোখ বুজলে হিম সাগর, চোখ মেললে অনন্ত নীল আকাশ !

বুকের মধ্যে সমস্ত রাত তুষারে ঢাকা পাহাড়

সমস্ত দিন সূর্য-ওঠার নদী...

তোর কি কোনো তুলনা হয় ?

তুই

ঘুমের মধ্যে জলভরা মেঘ, জাগরণে জন্মভূমির মাটি !

আর এক নদীর অমৃতভব

পাষাণে বুক রাখিস, কল্যাণী

শুনিস মন্ত বাঘিনী ডাকে সমস্ত দিন, সমস্ত রাত

দেখিস জীবন-মরণ লড়াই রক্তমাখা পায়ের ছাপ !

বুক জুড়ে তোর তবু তৃষ্ণার জল

নরখাদক পশুর রক্ত ধুয়ে ।

একজনকবি

চোখের বাইরে প্রাস মাইনাস পাওয়ার বদলায়

চোখের ভিতরে তার অনন্ত কুয়াশা

অন্ধকারও স্পষ্ট নয়, ভোরবেলায় ঘুম থেকে জেগে-ওঠা স্বদেশ, মানুষ

সাদা নাকি কালো; নাকি আলো থেকে আরো তীর জ্যোতির্ময়

স্বচ্ছ নয় ভিতর বাহির, শূন্য হৃদয়, কবিতা লেখে, কার জন্ত লেখে

সে জানেনা; শুধুই বাহবা জানে, অন্ধ ক'বে কবিতার

স্থলমাস্টারি করা যায়

কেননা কথারা তার বাধা, যেন হাজার অবোধ শিশু, ঘণ্টা বাজলে

সবাই 'প্রেজেন্ট স্মার'—

জানেনা, কবিতা শুধু কথা নয়, অগ্ন অমৃতভব অগ্ন গভীরতা,

তার ভিতর বাহির পরিপূর্ণ ভালবেসে ;

জানে না, সন্ধ্যার আলো-অন্ধকারে ছায়া ফেলে ঘরে-ফেরা মানুষেরা,

ছায়া ফেলে, দীর্ঘ হয় আগরণে রাত্রির স্বদেশ ।

অন্ধকার জন্মভূমি

যত বৃষ্টি ঝরে তত গভীর কুয়াশা

তার চোখ

শোক বাড়ায় ; ছায়ার মত শীতল বিকেলে
 শিশুর কান্নায় ঘর
 ভেসে যায় ;

ভুবনেশ্বরী আমার !

এত অসহায়
 বাংলার অড়িনা জুড়ে কালকেতু-ফুল্লরার
 পাতানো সংসার ?

নাচ

তারা এক পয়সার ফানুস ওড়ায়
 এক পয়সার দেশ ;
 তারা এক পয়সার কণ্ঠা নাচায়
 মেঘবরণ কেশ !

তাদের এক পয়সার ছোঁয়া লেগে
 নাচে রে কণ্ঠা ;
 নাচতে নাচতে আকাশ ভেঙে
 অশ্রুর বণ্ঠা !

হাজার শিশুর জন্মভূমি

হাজার শিশুর জন্মভূমি
 পুড়ে যায় ক্ষুধার চিংকারে
 আর কান্নার গর্জনে !

কোথা থেকে আসে এত বাধ ?

আমার পায়ের নিচে মাটি নেই

আমি শিশুকাল থেকে পরবাসী, মা গো !

কবে তোর স্তনে মুখ ছিল, কবে তোর বুক অমৃতের মত ছিল,

সব ভুলে গেছি ।

পরদেশে স্বাধীনতা বিষের মতই জলে, আমার মুখের ভাষা

আমি তাই চিনতে পারি না ।

নদীর এপারে নষ্ট ভালবাসা, কুয়াশায় জন্মভূমি গভীর আধার ;

মা আমার ! কবে তোর হ'য়ে গেছে ! আমার পায়ের নিচে

মাটি নেই—এ নরকে সব দৃশ্য স্বপ্ন মনে হয় !

লেনিন শতবর্ষের দু'টি কবিতা

১

কবর থেকে উঠে এলেন,

সামনে মহৎ সভা ।

অবাক হ'য়ে দেখেন তিনি

ভাষণ দিচ্ছে বোবা !

আরো অবাক, শুনছে যারা

জন্ম থেকে বধির তারা !

যে মুহূর্তে মুখ ফেরালেন

'হা হতোশ্মি' ব'লে,

লক্ষ খোড়ার মিছিল গেল

তাঁকেই পায়ে দ'লে !

২

তিনি কি শুধু মুখের শোভা

অথবা তিনি বুক ভুড়ে ?

তিনি কি আলো করেন সভা ?
 নাকি দূরে...বহু দূরে
 যেখানে বোবা শিশুরা হাসে
 রোগা মায়ের কোল জুড়ে,
 চোখের জল শুকোতে দেওয়া
 ছেঁড়া কাঁথার রোদুয়ে ।

শান্তি, ওঁ শান্তি

শান্তি, ওঁ শান্তি ! তুমি সর্বত্র বিরাজো
 পশ্চিম বাংলার পীঠস্থানে ।
 আহা ! সম্রাটের মহিমায় তুমি সাজো
 যা অশান্তি, অবাধ্যতা তোমার চরণতলে পিষ্ট করতে যুগ সন্ধিক্ষণে !
 আমাদের সন্তানের মুণ্ডহীন ধড়গুলি তোমার কল্যাণে ঘোর
 লোহিত পাহাড় ;
 আমরা সেই পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে গাইব উল্লেস স্বদেশ-বন্দনা ;
 ‘শান্তি, ওঁ শান্তি ! তুমি কি বাহার সেজেছ বাহার !’
 আ মরি পশ্চিম বাংলা ! তোর রক্তে স্বদেশের নিরাপত্তা ; ঘরে ঘরে
 সোনার আলনা !

এ দিনে, মানুষ নাম

(শ্রীযুক্ত অরবিন্দ পোদ্দারকে নিবেদিত)

মাথা উচু রাখতে হয় ঝড়ে, জলে
 কুয়াশায়,
 দশ দিকের কবন্ধ আধারে । কানে আসে
 ক্রীতদাস-ক্রীতদাসীদের হুগা ; তিন ভুবন
 মাছের বাজার, নাকি মানুষের মাংস নিয়ে
 চলে কাড়াকাড়ি ! রাস্তায় রক্তের নদী

পার হয় জ্বালাদেবী । কবির কবিতা লেখে
 শীতের কাঁথায় মুড়ি দিয়ে
 আপাদমস্তক ; নেতারা বক্তৃতা দেয় ; ধূমাবতী জন্মভূমি
 সর্বক্ষেত্রে ক্ষুধার অগ্নি দাউদাউ
 বাঁপ দেয়—কোথায়—কে জানে ?

এদিনে মানুষ নাম
 মনে হয় অশ্লীল তামাশা ! আমাদের সম্মুখের
 আমাদের চোখের সামনে
 রক্ত মাংস কর্দম, অথবা আততায়ী—কাপুরুষ ! আমরা
 গলিতনখদন্ত সিংহ
 নিরাপদ, সার্কাসের খাঁচায়, ঘোলাটে চোখের মণি—
 বিস্ফারিত—ক্রমে অন্ধকার হ'য়ে আসে...

তবু মাথা উঁচু রাখতে হয়, নরকেও । আমাদের চোখের আড়ালে
 ক্রমাগত রক্তক্ষরণের
 পিচ্ছিল নেপথ্যে আজও রয়েছে মানুষ—একা—নরক দর্শন করে,
 তবু অন্ধ নয়, খোঁড়া নয় ;
 রক্ত মাংস কর্দমের পাহাড় ডিঙিয়ে, নদী সাঁতারিয়ে
 নরক উত্তীর্ণ হ'তে ক্লান্তিহীন যাত্রা তার ;

মাথা উঁচু রাখাই নিয়ম ।

সমস্ত দিন, সমস্ত রাত

সমস্ত দিন, সমস্ত রাত
 পাপীর স্পর্শ, কাপুরুষের
 চোখ-রাঙানি !

সমস্ত দিন, সমস্ত রাত
ঘুমতে না পারার লজ্জা,
করুণাহীন....

রাস্তায় যে হেঁটে যায়

রাস্তায় যে হেঁটে যায়
জানে কি সে, কার এই রাস্তা ? এ শহর
কার ? এই দেশ....
নাকি ভাবে সবার ! এ রাজপথ
রাজার এবং ভিক্ষকের । এই দেশ
ইন্দিরার, এবং যে জেলখানায় রাত কাটায়, তার....

চোপ রও, উল্লুকের বাচ্চা ! বাঁচতে চাও,
এই রাস্তা ছেড়ে হাঁটো ! বাঁচতে চাও,
ভুলে যাও এই শহরের নাম ! এই দেশ
ফুটপাতে শুয়ে থাকা উলঙ্গের ;
কিন্তু যে উলঙ্গ আকাশের দিকে মাথা রেখে জেগে থাকে, তার নয় ।

মাতলামো

'I do not provoke, I am drunk.'

উত্তেজনা ছড়াই না ! কেননা এ মৃতবৎস্রা দেশে
আগুনের ফুল্কিগুলি শ্মশানের বাহবা বাড়ায় ।
দূর থেকে শোনা যায় শৃঙ্গালের হাসি আর হায়নার গর্জন ;
যত রাত দীর্ঘ হয় ততই বাঘের চোখ ভৌতিক আলোর মত, পাড়ায় পাড়ায়

ছড়ায় আতঙ্ক ! ক্রমে উলঙ্গের দীর্ঘশ্বাস, 'হা ভাত, হা ভাত' শব্দ ক্রীণ হ'য়ে
বাতাসে মিলায়...

উত্তেজনা ছড়াই না । বরং এ শ্মশানের শান্তি থেকে পরিভ্রাণ কী আছে,
কোথায়,

খুঁজি উন্মাদের মত ; ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলি দু'হাতে সরাতে চাই ;
কিন্তু আমার দুই হাত ভর্তি ভিক্ষার বিশ্বাস অন্ন—
আমি কাকে পথ দেখাবো ? কোন্ পথ ? 'স্বাধীনতা, হায় স্বাধীনতা—'
বুক যত তোলপাড়, ততই ভিতরে রক্ত জল হ'য়ে যায় !

মৃত্যুর ধোঁয়ায় ঝাপসা চোখে সব অন্ধকার । শুধু স্বর্গ মনে হয়
গেলাস গেলাস মদ, মানুষ নামের জন্তু যেখানে স্বাধীন, গায়

মাতলামোর গান

'কে কার তোয়াক্কা রাখে'...আমি সেই মাতালের কোমর জড়িয়ে হৈ হৈ
জীবনের স্বপ্ন দেখি, হয়তো কিছু বেসামাল কথা বলি : 'এ নরকে
ঈশ্বরের বাচ্চা আর নেড়ীকুত্তা সমান সমান—
কে কাকে রাঙায় চোখ !'

উত্তেজনা ছড়াই না । শুধু, মাথার ভিতরে মদ গাঢ় হ'লে
যে কোনো উলঙ্গ মানুষের কাঁধে মাথা রেখে, গভীর ঘুমাতে চাই ;
ঘুমের মধ্যে আমি স্বপ্ন দেখি, বাঘ-শিকারের স্বপ্ন, তখন আমার হাতে
অব্যর্থ নিশানা ।

আবার কখনো ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নে চিৎকার করি : 'এই সংবিধান বুঠা !
স্বাধীনতা ? কার স্বাধীনতা ?'

সমস্ত শরীর মদে ভিজ়ে গেলে, পাঁড়মাতাল, আকাশের দিকে আমি
উন্টো ক'রে ছুঁড়ে দিই এক ডজন কাঁচের গেলাস...

ফুটপাতে উলঙ্গ মানুষের গান

যে শীতে পালায় বাঘ
তার চেয়ে ঢের
নিষ্ঠুর শিকারী রাত
বধ ক'রে গেছে আমাদের !

আমরা মানুষ নই,
আমরা পশু-ও নই ;
আমরা শুধুই খাড়া
কুয়াশার কুকুর কাকের...

আদিম অরণ্যের গানগুলি

[আফ্রিকার লোকগাথা]

১

বাপ মরেছেন
আমাকে কেউ জানায়নি তো !
মা মরেছেন
আমাকে কেউ শোনায়নি তো !
আমার বুকের ভেতরটা মোচড়ায়,
কেবল চৈঁচায় :
হায়
হায় হায়
হায় হায় হায় হায় !

২

শিব্‌অ হে ! তোমার মনটা আমাকে দাও ;
তোমার ভাঁড়ার সকল সময় ভর্তি হে !

আমার মনটা নিয়ে নাও হে ;
 কুকড়ে যাওয়া, উপোস করা, হাঁ-করা মন ।
 তুমি নিলে, দুদিন খেয়ে বাঁচি, আমি খিদের জ্বালায় ধুঁকছি, ভোলানাথ !

পেটটি তোমার নাহুস-মুহুস, একটুও নয় ছোট,
 কিন্তু আমি খিদের জ্বালায় করছি ছটফট !

শিব্‌অ হে ! তোমার পেটটা আমাকে দাও ;
 খেয়ে-দেয়ে দিব্য মেজাজ ! আর, আমি যে খেতে পাইনা,
 আমার পেটটা নিয়ে নাও হে ; বুঝবে তখন খিদের কত জ্বালা !
 ও ভোলানাথ ! আমার ডানহাত তুমি নিয়ে তোমার হাতটা আমাকে দাও !
 আমার হাতে শিকার মরে না—কেবলই ফঙ্কায় !

৩

ছোকরা চাঁদ
 হেই ! জোয়ান চাঁদ
 হেই, হেই
 জোয়ান চাঁদ, আমাকে খবর শোনাও
 হেই, হেই

যখন সূর্য ওঠে, তোমাকে সেই খবরটা বলতেই হবে
 কী ক'রে আমি কিছু খেতে পাই
 এই ছোট খবরটা আমার কানে কানে তোমাকে বলতেই হবে
 যাতে আমি কিছু খেতে পাই
 হেই, হেই
 জোয়ান চাঁদ !

৪

চলো হে, লড়াইয়ের দিকে যাই—
 বদলা নেওয়ার এখানেই শেষ !

কার কাছ থেকে শুনলে হে
বদলা নেওয়ার এখানেই শেষ ?

ওহে, কার কাছ থেকে শুনেছ ঐ তাজ্জব কথা
বদলা নেওয়ার এত সহজেই শেষ ?

অথ মন্ত্রী কথা

১

রাজভবনে মন্ত্রী গজায়
খবর পেয়ে ব্যাঙের ছাতা
চিঠি লিখেছে আড়াই পাতা,
সে-ও একটি রাজত্ব চায় ।

২

আয় বৃষ্টি হেনে মন্ত্রী দেবো কিনে
বাজার থেকে সস্তা, এক পয়সায় দশটা

‘ক’টা মন্ত্রী কিনলি বাছা ?’
‘তিনটে পাকা, সাতটা কাঁচা ।’
মন্ত্রী পড়ে টুপ্‌টাপ্
সোনা গেলে গুপ্‌গাপ্...

৩

হ্যাঁদে লা ব্যাঙের ছাতা
এতকাল ছিলি কোথা ?
ছিলেম ভাই রাজভবনে ;
দাদা আমার মন্ত্রী হ’লো ।
আমারে যেতে হ’লো ।
দাদা নেন বংশী হাতে

আমি নিই কলসী কাথে ;
গিয়েছি থিড়কী দিয়ে ।

ছেলেটা দিচ্ছে ছয়ো
মেয়েটা তুরুক কাটে !

৪

নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো ম'রে রয়েছে,
মজ্জী হবার সময় বুড়ো নেচে উঠেছে...

ডিসেম্বর, ১৯৬৭

বাহবা সময়, তোর সার্কাসের খেলা

আশ্চর্য সময় আসে কুঁজে উল্লুকের পিঠে চড় কষিয়ে ; প্রাজ্ঞ চামচিকে
বিফারিত তামাশার বাহবায় মুহুমুহ বোবা হ'য়ে যায় ;
নৈঃশব্দ উলঙ্গ হ'য়ে ধেই ধেই নৃত্য করে...ক্রমে রাত হ'য়ে আসে ফিকে
মহান নেতারা ঘরে ফিরে যান...নিহত কবির শব পচতে পচতে বক্তৃতায়
মত হয় দেশপ্রেম-বিতরণী বেতারে, সভায় :

এ কাহিনী দেখে যারা, ফোকলা দাঁতে ফিক্ ফিক্ হাসে, আর শোনে যারা
হুর্দিনে তারাই থাকে টিকে !

কবি চান সোনার মেডেল

যা প্রতিবাদ যা প্রতিরোধ
তাদের সঙ্গে তোমার বিরোধ
কী ভঙ্গীতে ? কে নিভুতে
শিথিয়েছে তোমায় মিতে
এমন ক্লৈব্য, এমন দৈন্ত্য ;

যখন স্বদেশ অট্টেতন্য
 নরখাদক বাঘের খাবায় ?
 যখন নিত্য নরকে যায়
 নবজাতক, তার জননী ;
 তখন কোন্ ঐশ্বৰ্যে ধনী
 ‘শান্তি, শান্তি’ মন্ত পড়ে
 মুখের রক্ত সাদা করো ?
 প্রলেপ মাথা মুখের শোভা
 কে শেখালো এই বাহবা !
 যখন চতুর্দিকে আগুন
 এই পথে খুন, ঐ পথে খুন ;
 হনুনিয়ৈ তোমার গাড়ী
 চলছে তখন রাজার বাড়ি !

জলুক সহস্র চিতা অহোরাত্র এ পাড়ায়, ও পাড়ায়

‘...They say that to meet a funeral is lucky.’

—Gogol : Dead Souls.

তাহ’লে কী জন্ত আর একটি দুটি উলঙ্গের অনাহার মৃত্যুতে বিলাপ ? এক হাজার
 একলক্ষ, দশ লক্ষ, দশ কোটি মানুষের মৃতদেহ কেন নয় ; বল হে স্ববল সখা !
 মৃত্যুই মোভাগ্য যদি, যাক জাহান্নমে যত হাঘরে হাভাতে পড়শী ;
 জলুক সহস্র চিতা অহোরাত্র ও পাড়ায়, এ পাড়ায় ।
 সখা হে ! ক’বো না শোক দুর্ভিক্ষের দেশে ! আমরা মৃত মানুষের আত্মা
 কিলো প্রতি দশ টাকায় বিক্রী ক’রে লুটবো মুনাফা । হোক আগাছায়,
 মৃত মানুষের মাথার খুলিতে, পরিত্যক্ত অস্থি-র পাহাড়ে শ্মশানের মত এই দেশ :
 আমাদের ভবিষ্যৎ শ্রীরাধার মুখের মতই স্বর্গস্থলের উন্মাদ, পরকীয়া প্রেমে,
 নপুংসক উলঙ্গের নিধনে ; শোনো হে স্ববল সখা !
 ধর্ম তাই । লক্ষ্মী বাঁধা আমাদের শ্রমে,
 যুদ্ধে পরাভূত বক্ষিতের সর্বস্ব-লুণ্ঠনে ।

যৌবরাজ্যের বাসিন্দা

সে ছুঁড়ে দিয়েছে তার ভিক্ষাপাত্র—মাথার মুকুট ।

কিছুই চাই না তার সমস্ত পৃথিবী ছাড়া

তাই ঘরছাড়া

খোঁজে সে স্বদেশ রাজপথে, এঁদো গলিতে, ভিক্ষার মিছিলে,

ফুটপাতে শুয়ে থাকা মানুষের জিজ্ঞাসায় ;

খোঁজে বস্তীর অতল অন্ধকারে, কারখানার রক্তে আর ঘামে, ভূমিহীন

কৃষকের বঞ্চনায় কালো-মেঘ আকাশে ;

খোঁজে কিশোর ছাত্রের চোখে সমুদ্রের ঝড়, কিশোরীর সাদা হাতে

অমানিশার উত্তত খড়্গ—

খোঁজে সে স্বদেশ লক্ষ লক্ষ বেকারের সূর্য-করোটিতে ; উলঙ্গের মাথার উপর

আগুনের প্রচণ্ড স্পর্ধায় ! খোঁজে

জননীর উপবাসে, শিশুর কান্নায়, তার মনুষ্যত্ব—বৈঁচে থাকার গভীর অর্থ !

সে ছুঁড়ে দিয়েছে তার ভিক্ষাপাত্র—মাথার মুকুট ।

তার চোখের সামনে অগ্নি ভোরবেলা : ইতিহাস : মানুষের মুখ—

কথা বলে স্পার্টাকাস, নেচে ওঠে ম্যাগ্নাকাটা, গান গায় ফরাসী বিপ্লব ;

তার রক্তে বাজে নভেম্বরের দশ দিন, চীন কিউবা ভিয়েতনাম—

হাজার লেলিন—কোটি মানুষের তিন-ভুবন !

যৌবন

দশদিক থেকে তাকে ডাকছে ; তার অসহায় জন্মভূমি কৈপে উঠছে প্রত্যাশায় !

তুচ্ছ তাই রাজার রাজত্ব—তাকে হাতছানি দেয় কোটি মানুষের আলিঙ্গন,

তার লাল নিশান...

নীরেন, তোমার ন্যাংটো রাজা

নীরেন ! তোমার ন্যাংটো রাজা

পোশাক ছেড়ে পোশাক পরেছে !

নাকি, তোমার রাজাই বদলেছে ?

সেই শিশুটি কোথায় গেল
 যেই শিশুটি সেদিন ছিল ?
 নীরেন, তুমি বলতে পারো,
 কোথায় গেল সে ?
 নাকি, তুমি বলবে না আর ;
 তোমার যে আজ মাইনে বেড়েছে !

হেইও হো ! হেইও হো !
 পোশাক ছাড়া নীরেন, তুমি,
 তুমিও স্থাংটো !
 কিন্তু ঘরে তেমন একটি
 আয়না রাখে কে ?
 এই রাজা না, ঐ রাজা না ।
 তুমিও না ; আমিও না ।

হেইও হো ! হেইও হো
 পোশাক ছাড়া নীরেন, আমরা
 সবাই যে স্থাংটো !
 আমরা সবাই রাজা আমাদের এই
 রাজার রাজত্বে !

কিন্তু তুমি বুঝবে কি আর ;
 তোমার যে ভাই, মাইনে বেড়েছে !

ভেতরে মানুষ নেই

‘সাবধান ! কুকুর আছে !’ দরজায়
 রয়েছে কুকুর,
 নেই শুধু ভেতরে মানুষ...

তাই সাবধান !

বক্তৃতা বাবু

হেই বক্তৃতা বাবু! তুই ছই শহরের সাততলা বাড়ি থেকে
 নামলি মাচায়, এলি গাড়ী চড়ে মিটিং করতে
 আমাদের শরীরের কালো রঙ সাবান মাখিয়ে ফর্সা ক'রতে, আমাদের
 ছেলেমেয়েদের ভালো, সভ্য ক'রতে;
 এলি যেন লাটসাহেবের নাতি! বক্তৃতা দিয়ে যাবিও সেখানে—
 কল টিপলেই জল পড়ে। ঘর আলো হয় ঘুটঘুটে কালো রাতে;
 আবার বিজলি পাখাও ঘোরে—বক্তৃতা দিয়ে শরীরে যদিই ঘাম
 লাগে তোর, বক্তৃতা বাবু!

তুই বড় ভালো ছেলে। আমাদের জন্ম কত যে খাটিস-পিটিস!
 কেবল ঘরের বিজলী পাখাটা বন্ধ হ'লেই মেজাজ গরম;
 জলকে বরফ করার যন্ত্র—সেটাও বিকল!
 তুই না রাজার বেটা! রেশনের চাল ছেড়ে দিয়ে খাস বাসমতী চাল—
 তবু আমাদের জন্ম রাতে ঘুমাস না তুই; আহা রে, সোনার বাবু!

পিতা-পুত্র

আমার পিতা ওড়াতেন যৌবনে
 বাড়ির ছাতে 'ইউনিয়ন জ্যাক'।
 বয়েসে তাঁর বেড়েছে অভিজ্ঞতা;
 এখন ওড়ান আরেক পতাকা।

পিতার আমার ভয় ছিল যৌবনে
 স্বাধীন দেশে থাকবে না তাঁর খেতাব।
 এখন তিনি ভীষণ সাহসী;
 খেতাব আছে, বেড়েছে কালো টাকা।

আমার পিতা গাইতেন যৌবনে
 ‘দিল্লীখরী, জগদীখরী বা।’
 এখনো তাঁর কণ্ঠে এক গান ;
 আমারই শুধু বেঁচেবর্তে থাকা।

ভিক্ষার মিছিল যায়

ভিক্ষার মিছিল যায় ;
 নরখাদক বাঘের সিংহদরোজায়
 পাঠায় স্মারকপত্র, চায়
 নিরাপত্তা—একটি দুটি স্বপ্ন-দেখা জীবনের বিনিময়ে
 ক্রীতদাস পশুদের উলঙ্গ অভুক্ত বেঁচে থাকার অস্তিত্ব।

জীবন

এখনো আশ্চর্য রূপকথা, এই বিংশ শতাব্দীতে ;
 দেখি তাই...

অথ নীলবর্ণ শৃগাল কথা

চল্লিশে হ’য়েছিল অনেক প্রগতি
 আমাদের কর্মে ও চিন্তায় ;
 আমরা ছিলাম সৎ, আমাদের মহিলারা সতী।

স্বতন্ত্র্য সত্তরে ‘ধিন্ তা, তা ধিন্ তা’—
 যে ম্যাজিক দেখাবো হে, খুবই কঠিন তা।
 চল্লিশে হ’য়েছিল অনেক প্রগতি
 দেশজুড়ে আজ শুধু ছিনতাই !
 হুসু, আমরা সৎ, আমাদের মহিলারা সতী।

নির্বাচিত কবিতা

মোর্চার সাঙাতেরা 'তেরে কেটে, তেরে কেটে'—
এর মুণ্ডটা ওর ধড় থেকে নিলে কেটে,
যে ম্যাজিক দেখাবো হে, খুবই কঠিন তা—
জাগাবো গৃহস্থকে ; চোরকে বলবো, নেই চিন্তা !
চল্লিশে হয়েছিল অনেক প্রগতি
সত্তরে 'ধিন্ তা, তা ধিন্ তা',—
আমি সৎ, আমাদের চৌদ্দপুরুষ সৎ, আমাদের শ্রীমতীরা সতী ।'

আর এক মহিষাসুর

অসুর রে । তুই যাত্রাদলে যেই লেখালি নাম,
হলি মহিষাসুর, সে কী তিড়িং নাচ তখন তোর ;
বাপ্‌রে, সে কী ভয়-দেখানো সার্কাসের খেলা ।

যতই বাড়ে বেলা, ততই মেজাজ তোর চড়া, যেন
এর মুণ্ড খসাবি, ওর চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাবি !
আমরা ভাবি কোথায় পালাই, এমনি তোর হলুদুল কাণ্ডকারখানা !
তোকে করবে মানা, কারুর নেই এমন বুকের পাটা—
তুই যে বাপের ব্যাটা ! পরের হাড় কড়মড় ক'রে খাওয়াই

ধর্ম তোর, সেই তোর ছোঁ-নাচ !

সূর্য অস্ত গেলে বুঝি এবার শান্তি—কিন্তু তুই যে স্বয়ং অশান্তি ;
ছকারে তোর গাছগুলিও পাথর, কোলের শিশু কান্না ভুলে

কঠিন কাঁপতে থাকে—

গাঁয়ের মাসুখ যে যার ঘরে দরজা দিয়ে সমস্ত রাত জেগে কাটায় !

যতক্ষণ না ফুরায় তোর স্পর্ধা, তোর সার্কাস, তোর মুখোশ নাচের বাহাদুরী—

যতক্ষণ না পাড়ার ধুখুড়ে বুড়ি তোর ছ'গালে চড় ক'বিয়ে

বলে তোকে, 'হারামজাদা ! এবার যুঁতে যা !'

আফ্রিকা

(নিহত প্যাটিস লুগ্‌স্বাকে মনে বেথে)

রক্তাক্ত শিশুর দেহ লুফে নেবে রাক্ষসী গ্রহণ
নিষ্পাপ পিতার কণ্ঠে স্তব্ধ হবে বীভৎস গোড়ানি
যে মাটিতে কান পাতবো, শুনবো নরকের কানাকানি
পশুর খাবায় নষ্ট প্রেম হাঁটবে প্রেতের মতন
আমাদের হৃদপিণ্ডে ; ভ্রষ্ট চাঁদ-সূর্যের বমন
ত্রিভুবন বিষ করবে, কেঁদে উঠবে বেগুন ও জননী !

সব ছবি মনে আছে ; পৃতিগন্ধময় বেইমানী !
ঘৃণায় সর্বাস্ত্র পাপ, স্মৃতি পাপ, জীবনধারণ
ভয়ঙ্কর অপরাধ ! জায়া পুত্র জন্মভূমি পণ—
চোখে ভাসছে পাশাখেলা, গৃহযুদ্ধ ; একফোটা আমানি
কোথাও ক্ষুধার জন্ম থাকবে না ।...সব দৃশ্য জানি ;
ভ্রাতৃহস্তা দানবেরা উপড়ে নেবে তৃতীয় নয়ন !

আফ্রিকা ! সমস্ত জেনে তোমার প্রলয় বুকে টানি—
মৃত্যু পরিত্যক্ত ক্রোধ, মৃত্যু আজ মন্ত্র উচ্চারণ !

যাদের সঙ্গে তুমি পার্টি করো, কখনো কি করেছ জিজ্ঞাসা...

(গোলাম কুদ্দুস, কবি-কে)

গোলাম কুদ্দুস ! তুমি লিখেছিলে 'ইলা মিত্র'—বিখ্যাত কবিতা,
প্রতিবাদ করেছিলে তোমার যৌবনকালে নারীর চরম অসম্মানে !
অগ্নিশুদ্ধ কবি তুমি, এখনও অটল ধর্মে । যদিও লেখ না আজ

রাত জেগে কবিতা—

দ্রষ্টা তুমি ! দেখ না কি আবার দশদিক অমা বিক্ষারিত ধরিত্রীর রক্তের বমনে ?

গাণ্ডীব দিয়েছ ছুঁড়ে ? কিন্তু তুমি সাংবাদিক, লেখ তো কাগজে
প্রত্যহের রোজনাম্‌চা । তোমার কলমে তবে কী-জন্ম জলেনা আজ তুধের আগুন ?
যখন স্বপ্নেও রোজ হানা দেয় হাটে, মাঠে, অস্তঃপুরে, প্রকাশ্য রাস্তায়
ভাড়াটে জল্লাদ—করে নির্বিচারে শিশু, যুবা, এমন কি সীমন্তিনী কল্যাণী-কে খুন !

কবিতা লেখ না তুমি, কিন্তু যারা আজও লেখে ‘জামায় রক্তের দাগ’

গঙ্গাজলে ধুয়ে—

নারায়ণী সেনা তারা, তোমার মতই দীপ্ত, স্বধর্মে অটল ছিল

চল্লিশের প্রচণ্ড হুপুড়ে !

তাদের সঙ্গেই তুমি পাটি করো ; কখনো কি নিভুতেও করেছ জিজ্ঞাসা :

‘ছেলে গেছে বনে’ যার, সেও কেন কৈকেয়ীর অধর্মে দিয়েছে তার রাজমুকুট ছুঁড়ে ?

কমরেড কুদ্দুস ! তুমি দেবে কি এ গোলমеле ধাঁধার উত্তর ?

তুমি কবি, একদিন লাহিতা নারীর বেণী-না-বাঁধার প্রতিজ্ঞাকে জানিয়েছ

অমল প্রণাম ।

আজ সেই মহীয়সী মহিলাও হেঁটমুণ্ডে হুঃশাসনের জন্ম ভোট কুড়ান

দরজায়, দরজায় !...

তোমার অনেক আগে এই দেশে বোবা হয়ে গিয়েছেন নজরুল ইসলাম !

৩ মার্চ, ১৯৭২

হাসে দ্বারকার পথে ঘাটে ভাড়াটে জল্লাদ

জীবন কেমন স্থির হ’য়ে গেছে নতজাছু ক্রীতদাসদের

সাক্ষ্যসঙ্গীতের অবাক সভায় !

মাঝে মধ্যে কোলাহল ভেসে আসে, গুলিবিক শাহুলের মাংস ছিঁড়ে নিতে

সারমেয়গণ দ্রুত ছুটে যায় ;

তাদের অশ্লীল বাহবার কাঁপে ভুবনমোহিনী রাত্রি,

স্নান হ’য়ে যায় জ্যোৎস্নার নক্ষত্র,

বিভূষণ মাথা নাড়ে দীর্ঘ তরুণী—

আহা, জীবন ! আবাদ করলে হ'তো সোনা সেই মানব জীবন
 আজ এমনি ইতর রসিকতা !
 হাসে দ্বারকার পথেঘাটে ভাড়াটে জল্লাদ, জননীর পরিত্যক্ত
 নবজাত শিশুর কান্নায়...

১৯৭২

ভয়ের গল্প এবার থামা

ভয়ের কথা বলিস নে আর
 চোখ রাঙিয়ে বলিস নে অ'র
 মুখ বাঁকিয়ে বলিস নে আর...

শুনতে শুনতে, ভয়ের কথা শুনতে শুনতে
 কখন দেখি হাই তুলে এক ছোট্ট শিশু
 বলছে : 'আরেক গল্প বলা ; আরেক গল্প

ভয়ের গল্প একেবারে বাজে ।'

২৬ জানুয়ারী, ১৯৭৪

১

জীবন-বীমা অফিসে লক আউট
 এয়ারলাইনে লক আউট
 চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট
 চিকিৎসকদের ধর্মঘট
 চা-শ্রমিকদের ধর্মঘট, ঘেরাও, মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদ
 অধ্যাপকদের মিছিল, প্রতিবাদ, চব্বিশ ঘণ্টা অবস্থান
 শিক্ষকদের মিছিল, প্রতিবাদ
 গুজরাটে ক্ষুধার্তের মিছিল, পুলিশের গুলিতে তিরিশ জন নিহত

মহারাজ্বে ক্ষুধার্তের মিছিল
 মন্ত্রিসভার পদত্যাগ-দাবিতে কলকাতায় ছাত্র পরিষদের মিছিল
 এসব ঘটনার মানে কী ? তাৎপর্য কী ?
 মাননীয় রাজ্যপাল ডায়াম
 মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়
 মাননীয় খাজনমন্ত্রী
 মাননীয় শ্রমমন্ত্রী, মাননীয় আইনমন্ত্রী !
 আপনারা কি এখনো চোখ-কান খোলা রেখেছেন ?
 অনুভব করছেন, সময় কোথায়, কীভাবে পাগলা ঘণ্টা বাজাচ্ছে !

২

সর্বের তেল বারো টাকা থেকে কুড়ি টাকা কিলো
 চিনি উধাও
 লবণে বিষ, চালে আগুন
 কয়লায় আগুন, কেরোসিনে আগুন
 অধ্যাপকরা পাঁচ মাস মাইনে পান না
 শিক্ষকেরা মাইনে পান না
 কয়লাখনির মজুরেরা
 চটকলের মজুরেরা
 চা-বাগানের মজুরেরা
 কেউ অর্ধাহারে, কেউ অনাহারে...
 অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ এখন আর কোনো সংবাদই নয় ।
 চাষীরা মহাজনদের কাছ থেকে অক্টোবরে চার টাকা কিলোয় চাল কিনেছে ;
 মহাজনেরা এক কিলো চালের দাদন নিচ্ছেন এখন চার কিলো
 দশ কিলোর জায়গায় চল্লিশ কিলো...
 পঁচিশ কিলোর জায়গায় একশো কিলো...
 এসবও কোনো সংবাদ নয় ।
 চাষীরা জানে, তিন মাস পরে তাদের অনাহারে মরতে হবে
 বেকারেরা জানে, রাজনীতি করুক আর নাই করুক,

পুলিশ তাদের খুঁজে বের করবে.

শ্রমিকেরা জানে ছাঁটাই আর লক আউটের ঝাতাকলে তাদের

পিষে মারা হবে

শিক্ষকেরা জানে...

সমস্ত দেশ এখন বানের জলে ভাসছে

হু হু করে বেড়ে চলেছে গ্রাজুয়েট, এম. এ. পাশ, ইঞ্জিনিয়ার,

ডাক্তার বেকারদের সংখ্যা

বেড়েই চলেছে পুলিশের গুলী-খাওয়া মানুষের সংখ্যা

বাড়ছে মহাজনের ঘরে ভাগচাষীর দেনা, যা এখনই আকাশ স্পর্শ করছে

বাড়ছে ভেজাল যা বাপকেও রেহাই দেয় না

বাড়ছে কালোবাজার, তিমি মাছের চেয়েও প্রকাণ্ড যার হাঁ !

শুরু হয়ে গেছে সমস্ত ভারতবর্ষে ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল

আদিবাসী উলঙ্গ মানুষদের কান্না এখন দশহাত ধুতি-পরা মানুষগুলিকেও

চারদিক থেকে ঘিরে ফেলছে !

গাঙ্গেয় সমতলের পলিমাটি এখন পাথরের মত রুক্ষ, সেখানে ফসল ফলে না

যা মাঠে ফলে তাও ঘরে আসে না,

রাতারাতি উধাও হয়ে যায়—কোথায় যায়—তার উত্তর মেলে না !

উত্তর মেলে না বলেই একসময় কান্না-গোড়ানির শব্দগুলি শুরু হয়ে আসে ;

তারপর শোনা যায় সমুদ্রের গর্জন ।

পুলিশের সাধ্য কী

মিলিটারীর সাধ্য কী

দিল্লীর ঈশ্বরীর ভাড়াটে জল্লাদদের সাধ্য কী

এই কান্নার মিছিল, এই মিছিলের গর্জনকে গলা টিপে হত্যা করে !

তোমরা আমাদের চোখ ছুটি উপড়ে নিতে চাও, উপড়ে নাও !

আমাদের জিভ ছিঁড়ে নিতে চাও, আমাদের ধড় থেকে

মুণ্ডগুলি খসিয়ে দিতে চাও

আমাদের ন্যাংটো করে শেয়াল-শকুনদের সামনে ছুঁড়ে দিতে চাও—

তাই হোক । মানুষ আর এখন মৃত্যুকে পরোয়া করে না

দেখছো না ! সমুদ্রের লোনা পানিকে ছাড়িয়ে গেছে উলঙ্গ মানুষের

কান্না আর আর্তনাদ

সমুদ্রের তুফান, গর্জনকে ছাড়িয়ে গেছে আসমুদ্রহিমাচল বঞ্চিত মানুষের

চাপা গর্জন ।

ক্রমাগত ব্যতিচার ক'রে ক'রে দূষিত পাপের রক্ত শরীরে নিতে নিতে

তোমরা এখন অন্ধ, তাই দেখছো না...

৩

পশ্চিমবঙ্গের সুবেদার মাননীয় রাজ্যপাল !

এই রাজ্যের সম্মানিত মুখ্যমন্ত্রী !

শুনতে পাই আপনারা সকল কিছুর উদ্দেশ্য ;

মানুষের গ্নায়-অগ্নায় পাপ-পুণ্য আপনাদের কিছুই স্পর্শ করে না...

আপনারা এই সময়ে কিছু কথা বলুন !

আমরা এখনই আপনাদের কাছ থেকে সমস্ত ঘটনার ব্যাখ্যা চাই ।

আপনারা বলুন,

এইভাবে রাজ্যপাট শাসন আর শোষণ

আর কতদিন চলবে ?

আপনার কি শুনতে পাচ্ছেন, ঘণ্টা বাজছে, দূরে, কাছে,

একসঙ্গে অনেকগুলো

পাগলা ঘণ্টা ?

যা শুনে জেলখানার খুনী আসামীদেরও বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে !

সেই ঘণ্টা বাজছে, দূরে, তারপর কাছে, তারপর একেবারে কাছে, তারপর...

সেই মানুষটি, যে ফসল ফলিয়েছিল / আন্তোনিও জাসিনটো

সেই বিরাট খামারটিতে কোন বৃষ্টি হয় না

আমার কপালের ঘাম দিয়ে গাছগুলিকে তৃষ্ণা মেটাতে হয় ।

সেখানে যে কফি ফলে আর চেরী গাছে যে টুকটুকে লাল রঙের বাহার ধরে

তা আমারই ফোঁটা ফোঁটা রক্ত, যা জমে কঠিন হয়েছে ।

কফিগুলিকে ভাজা হবে, রোদে শুকোতে হবে, তারপর গুঁড়ো করতে হবে

যতক্ষণ না তাদের গায়ের রঙ হবে আফ্রিকার কুলির গায়ের রঙে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ !

আফ্রিকার কুলির জমাট রক্তে ঘোর কৃষ্ণবর্ণ !

যে পাখিরা গান গায়, তাদের জিজ্ঞাসা করো,

যে বর্ণাৱা নিশ্চিস্ত মনে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে, তাদের :

এই মহাদেশের মধ্যকার মানচিত্র থেকে যে বাতাস মর্মরিত হচ্ছে, তাদের :

কে ভোর না হতেই ওঠে ? কে তখন থেকেই খেটে মরে ?

কে লাঙল কাঁধে দীর্ঘ রাস্তা কুঁজো হয়ে হাঁটে, আর কেইবা

শশুর বোঝা বইতে বইতে ক্লান্ত হয় ?

কে বীজ বপন করে আর তার বিনিময়ে যা পায় তা হলো

ঘণা, বাসি রুটি, পচা মাছের টুকরো,

শতচ্ছিন্ন নোংরা পোশাক, কয়েকটা নয়া পয়সা ? আর এর পরেও

কাকে পুরস্কৃত করা হয় চাবুক আর বুটের ঠোকর দিয়ে ?

—কে সেই মানুষ ?

কে ক্ষেতগুলিতে গম আর ভুট্টা ফলায়, আর সারি বাঁধা

কমলা গাছগুলিতে ফুলের উৎসব আনে ?

—কে সেই মানুষ ?

কে ওপরওলাকে গাড়ী, যন্ত্রপাতি, মেয়েমানুষ কেনার টাকা

আর মোটরের নিচে চাপা পড়ার জন্তু নিগ্রোদের মুণ্ডগুলি যোগান দেয় ?

কে সাদা আদমীকে বড়লোক তৈরী করে,

তাকে রাতারাতি ফাঁপিয়ে তোলে, পকেটের টাকা যোগায় ?

—কে সেই মানুষ ?

তাদের জিজ্ঞাসা করো ! যে পাখিরা গান গায়,

যে বর্ণাৱা নিশ্চিস্ত মনে এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে,

যে বাতাস এই মহাদেশের মধ্যকার মানচিত্র থেকে মর্মরিত হয়,

তারা সকলেই উত্তর দেবে :

—ঐ কালো রঙের মানুষটা, যে দিনরাত গাধার খাটুনি খাটছে !

আহা ! আমাকে অস্ত্র ঐ তালগাছটার চুড়ায় উঠতে দাও
সেখানে বসে আমি মদ খাবো, তালগাছ থেকে যে মদ চুঁইয়ে পড়ে ;
আর মাতলামোর মধ্যে আমি নিশ্চয়ই ভুলে যাবো, ভুলে যাবো, ভুলে যাবো :

আমি একজন কালো রঙের মানুষ, আমার জন্তেই এই সব ।

বন্ধ অটালিকা / ওলগা কির্চ

বিভীষিকার কালো পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে আছে এই দুর্গ,
দরজাগুলি একের পর এক বন্ধ করে দিয়েছে ঘৃণা ।

যে বানিয়েছে এই প্রাসাদ, দেয়ালের ফোকরে—শক্তমুঠিতে—ধরে আছে
তার বন্দুকের নল ;

দেয়ালে কী লেখা আছে, তা দেখার জন্য এতটুকু মাথা-নাড়ানোর
সাহস নেই তার ।

ক্রীতদাস

মাক্স' না পড়েই মাক্সবাদে তাঁর ঘৃণা
লেখেন মনীষী বাজারে পত্রিকায় ।
দাসের বাজারে এটাই ফ্যাসন কিনা ;
তা ছাড়া পকেটে পয়সাও পাওয়া যায় ।

হত্যা

স্বর্ণশিল্পীদের মনে রেখে

একথা ঠিক, তাদের বুকে কেউ ছুরি বসিয়ে দেয় নি ;
এ কথা ঠিক, তাদের মুখে কেউ বিষ তুলে দেয় নি ;

তাদের খুন করা হয়েছে অত্যন্ত ভদ্রভাবে, সভায় হাত তুলে
স্বদেশের আর স্বাধীনতার নামে ।

১৯৬৩

সিংহাসনে বসলো রাজা

বাইরে একটু বাতাস আসতো
গাছতলায় শান্ত হয়ে নামতো আলোর আশীর্বাদ
পথে বেরুলে পায়ের নীচে মাটি যদিও আগুন, তবু
পথ চলায় বাহবা ছিল, মিছিলে ফুলের মালা ।

কবে যে হাতের লাল নিশান মাথার মুকুট হলো
দরজা জানলা বন্ধ একটা বিরাট ঘরে জ্বললো হাজার ক্যামেরা ;
'দেখো ! সিংহাসনে বসলো রাজা ।'

সারাদিনের ক্লাস্তি শেষে গাছের ছায়ায় মাথা রাখার
দীঘির জলে পা ডুবিয়ে ব'সে থাকার, স্বপ্ন দেখার
দিনগুলি স্নান মুখে বিদায় নিয়ে গেছে । এখন
দারুণ গ্রীষ্মে চামর দোলায় ভক্তেরা আর বাইরে হাঁটে ক্ষুধার মিছিল,
তার দেখতে বারণ ।

জননী বলেন

ঐ রাস্তায় যাস্ নে, বাছা !
সাপ নয় ; কিন্তু তার চেয়ে বেশী । তুই অন্ধ,
দেখতে পাস না,

ঘুরছে পুলিশ !

এই নরকে

কবির কোথায় আজ ? উত্তরার জলসা ঘরে এখনো কি নাচ শেখায় তারা ?
এদিকে যে শমীবৃক্ষে মন্ত্রপড়া অস্ত্রগুলি কীচকের বাড়ায় আহ্লাদ !

নির্বাচিত কবিতা

তুনি পাড়ায় পাড়ায় জন্মদের আফালন ; দেখি ঘরে ঘরে
নরখাদকের রক্তমাথা থাবা, পিশাচের মার...

কবির কোথায় আজ ? সবাই কি দুর্ঘোষনের কেনা,
নাকি বিরাট রাজার ক্রীতদাস !

নতুন প্রত্যয়

‘Workers of the world, unite !’

—Communist Manifesto

আসলে ক্রুশবিদ্ধ হওয়াটাই সব নয় ;
তাতে একজন মানুষের শরীর রক্তাক্ত হয়
কিন্তু যারা পেরেক দিয়ে ঐ শরীরকে এ-ফোড় ও-ফোড় করে
তাদের কিছু আসে যায় না ।

বরং এসব মহানুভবতা বঞ্চিত মানুষকে আরো নতজানু হ’তে শেখায়
আর যাদের এমনিতেই পোয়া বারো, তারা দু’পয়সা বেশী চাঁদা দিয়ে
গীর্জাগুলির শোভা-বৃদ্ধি করে

যাতে রক্ত দেওয়াটাকে মনে হয় গৌরবের মতো
আর কারখানা খনি খামার থেকে মন্দির ও বেথালয় পর্যন্ত
মানুষের রক্ত ক্রমেই কালো হতে থাকে ।

আসলে ক্রুশবিদ্ধ হওয়া নয়
ক্রুশটাকেই ভেঙে ফেলা দরকার ।
সর্বহারার শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছুই হারাবার নেই
কিন্তু অর্জন করার আছে—
পুরানো বস্তাপচা বিশ্বাসগুলির বিপরীত
কোনো নতুন প্রত্যয়, যা একদিন মানুষকে সত্যিকারের ধর্ম শেখাবে ।

আর সে মানুষ নিশ্চয় পায়ে শিকল পরে
ঈশ্বরের নির্দেশ মানতে
একটি বীভৎস হত্যাকাণ্ডের দিকে নিজের গলাটা বাড়িয়ে দেবে না ।

আশ্চর্য মুহূর্ত আসে, চলে যায়

আসে যায় নভেম্বর আমাদের বাৎসরিক গীতা পাঠে, প্রত্যাশায়,

রক্তের কল্লোলে ;

পাণ্ডব শিবিরে জলে লণ্ঠনের লাল আলো ; যেন রাত ভোর হবে তাই রাত

জেগে থাকবো ব'লে

আমাদের বুক-ভর্তি স্বপ্ন স্থির হ'তে চায় । তারপর নীতের কাঁথায় মুখ ঢেকে

আসে কুয়াশা, কুয়াশা শুধু ;

মনে হয়, গভীর রাত্রির চেয়ে অন্ধকার আমাদের নভেম্বরের দিনগুলি আর

ইতস্তত পলাতক পদচিহ্ন, বিনাযুদ্ধে শ্মশানের শাস্তি—তার অবসাদ
সমস্ত জীবন ।

তবু আশ্চর্য মুহূর্ত আসে ; আমাদের কুঁজো পিঠ খাড়া ক'রে সটান দাঁড়াতে

আনে সারথীর বার্তা—একটি মুহূর্ত—মনে হয় আমরা নই চিরকাল

লেজগুটানো নেড়ীকুত্তা, হাঘরে, হাভাতে ...

এইখানে তোঁর জন্মভূমি শুয়ে আছে, প্রতীক্ষায়

এ কবন্ধ অন্ধকারে চারদিক যদি তোঁর মৃত্যুর পাহাড়

আর ভয়, তোঁর রক্ত হিম ক'রে নেমে আসবে এক লক্ষ সাঁজোয়া পুলিশ ;

যেদিকে হাঁটবি তুই, গর্জাবে নরখাদক

আর কাঁটাতারে ঘেরা বন্দীর শিবিরগুলি খুঁজে লাল,

কেউ নেই সামনে তোঁর । দেবতার সবাই মুখোশ, অথবা খড়ের মূর্তি ;

এই নরকেও কেমন আশ্চর্য স্থির...

আর তুই ছায়ায় মতন, মাটিতে মিশিয়ে বুক, শুনিস বুটের শব্দ

এ রাস্তায়, ও রাস্তায় ! তবু রাস্তা, তোঁর মত হাজার হাজার উলঙ্গের

একটিই কান্নার রাস্তা—এই তোঁর ঘর—যেদিকে ছুঁচোখ যায় ;

তুই অনুভব কর, এইখানে তোঁর জন্মভূমি শুয়ে আছে রক্তের সমুদ্রে,

প্রতীক্ষায়...

তোর নিরাপত্তা

আমি তোকে ঠিক লুকিয়ে রাখবো
 আমার শিরা-উপশিরার মধ্যে
 সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায়
 যদি তুই শপথ নিয়ে থাকিস
 একদিন আমারই দেওয়া
 তোর মনুষ্যত্বকে
 রক্ত-পতাকার মতো তুলে ধরবি
 সেই সব ডাকিনী বিচার মুখোমুখি
 যারা বমন করে বীভৎস অমানুষিকতা
 ষড়যন্ত্র আর মৃত্যু

আমার কাজ
 এখন তোকে সম্ভরণে লালন করা
 আমার ধমনীর মধ্যে
 যেখানে আমার রক্তের আগ্নেয়গিরিকে
 আমি প্রাণপণ ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি
 সেই ভবিষ্যৎ দিনটির জন্য
 যখন সময় আসবে
 যখন পাহাড়ের মতো বিরাট
 পাথরের অঙ্ককারগুলিকে
 ভাসিয়ে ছিঁড়ে তলিয়ে নিয়ে যাবে
 এক অপরাজেয় মিছিলের
 হাজার হাজার রক্ত-পতাকা
 আর গড়ে উঠবে
 তোর মতো মানুষদের মৃতদেহের ওপর
 এক নতুন মনুষ্যত্ব
 তার সভ্যতা

মিছিলে ২

১

সামনে, পিছনে, ডানে, বাঁয়ে
মাত্র কয়েকটি পুরনো মুখ ;
আর যারা, একেবারেই কিশোর
আর যারা, জেলের অন্ধকারে বহুদিন হারিয়ে যাওয়া শিশুগুলির
কেউ মা, কেউ বোন...

২

বৃষ্টির পর আকাশ এখন
রৌদ্রের দিকে মাথা তুলেছে। তাদের কণ্ঠের ঐক্যতান
বিষাদ এবং প্রতিজ্ঞার একটিই অবগাহন।
তারা এখন সেই সব শব্দ আর ধ্বনিকে খুঁজছে
যারা আমাদের ধমনীর ভিতর প্রবাহিত রক্তকেও
গাঢ় এবং অর্থময় করে তুলতে পারে।
অথচ তাদের রক্তনিংড়ানো ভালবাসা থেকে
শব্দ আর ধ্বনিগুলি যখন জন্ম নিচ্ছে, হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে
উর্ধ্বে, আকাশের দিকে—
তারা বহু শৃঙ্খলিত মানুষের ধিক্কার, ঘৃণা, প্রতিবাদ আর দাবি ছাড়া কিছু না।
আবার অনেক কিছু ; কেন না মানুষের অভিজ্ঞতার শেষ নেই—
দিনের পর দিন রক্তের সমুদ্র সাঁতারিয়ে মানুষ জেনেছে,
ভালবাসার আরেক নাম ঘৃণা ;
রাতের পর রাত স্পর্ধার পাহাড়ে আছাড় খেতে খেতে সে জেনেছে,
ভালবাসার আরেক নাম প্রতিবাদ !

৩

কিছু আগে, আর একেবারে পিছন থেকে
কালো রঙের পুলিশ-ভ্যান একটা বিরাট অজগরের মতো তাদের
ঘিরে রয়েছে।

তারা সংখ্যায় মাত্র কয়েকজন, কেন না, পুরনো বন্ধু
তাদের পরিত্যাগ করেছে। তবু তারা রাস্তায় নেমেছে। এক ভয়াবহ
পাশবিক শক্তির প্রহারে জর্জর
হাজার হাজার কিশোরের আর কিশোরীর রক্তে-ভাসা মুখগুলি মনে রেখে।

একটি অসমাপ্ত কবিতা

'The breath of his life
He has taught to be language,
The spirit of thought'.—Sophocles

জীবনের নিঃশ্বাস যে ভাষা
আমাদের চৈতন্যকে করে যে বাঙ্গায়, অবচেতনাকে জ্যোতির্ময় ;
আমাদের বুকের ভিতরে রক্ত-চলাচল স্পন্দিত করে যে মস্তিষ্কে,
মানবিক প্রত্যয়ে, শপথে ;
আত্মাকে যে শুদ্ধ করে তেজে, করুণায় করে নমনীয়, প্রেমে অপরূপ।
স্বাধীন, স্বচ্ছ মুক্তধারা !

যদি শৃঙ্খলিত হয় ! যদি বিক্ষোভিত হয় হৃৎপিণ্ডের রক্ত-নদী ! যদি...

জলে ভাসে মাঘব্রত

'And the crows swim in a well of blood'.

১

নীতের মতই রক্ত মিশে আছে কবিতায়
মৃত্যুর মতই রক্ত মিশে আছে কবিতায়।
নীত যা হলুদ পাতা যা মাটির নীচে ঠাণ্ডা শব্দধার

মৃত্যু যা বিবর্ণ ঘাস, রাস্তার দু'পাশে পড়ে থাকা হিম সাপের খোলস ;
কবিতা যা অনির্বচনীয় শাস্তি, শাস্তি শুধু, আর চাপ চাপ রক্ত...

২

মাঘ মাসের ঠান্ড ছিঁড়ে, নদী ছিঁড়ে, রাত্রির গর্ভের যন্ত্রণায় স্থির শুয়ে থাকা
সবিতার ব্রত ছিঁড়ে
পাপড়িগুলি দে ছড়িয়ে বাতাসে, মেহের আলি ! খেলা দেখবি, বাতাসে
রক্তের খেলা ।

সেই রক্ত পান ক'রে শীত তাড়াবে তীর্থের ভূশঙী কাক,
সেই রক্তে স্নান ক'রে মৃত্যুকে বুড়ো আঙুল দেখাবে খড়ের কাকতাদুয়া, যে
কমতুলে শাস্তিবারি নিয়ে ঘোরে, যদিকে যখন হাওয়া ছিঁড়ে ফেলতে
চায় ঘুম ।

৩

কান্নায় যে ভেঙে পড়ে, কী আছে অস্তিত্ব তার ?
তার জন্মভূমি আজ অন্য এক সমারোহ, চারদিকে কুকুরের ঘাম আর
জাহাজ-ভর্তি পণ্য—পচা গম, পোশাকী আতর !
এক-পয়সায়-কেনা কবি শুধু রক্ত মোছে শুয়োরের দাঁতবসানো গাল থেকে,
আর ওড়ে এক হাজার লক্ষা পায়রা,
আর হুঁশিয়ার করে সার্কাসের বুড়ো ভাঁড় : 'রাস্তা ছাড় ! রাস্তা ছাড় !
সম্রাজ্ঞীর হাত ধ'রে আসছেন দেবতা ব্রেজনেভ !'

যে জাগে, মাটিতে কান রেখে, মুঠোর মধ্যে রক্তমাখা শাস্ত হলুদ ঘাসের ফুল ;
কুয়াশায় তাকে দেখা যায় না...

নভেম্বর, ১৯৭৩

ভিক্ষার রুটি

'...bread that increased the hunger.'

এ রুটি ছুঁসনে ! এই ভিক্ষার অবাক রুটি—যার ছায়ায় পৃথিবীর
খুন লেগে আছে ।

এ রুটির হাওয়াতেও দাউ দাউ ক্ষুধার আগুন ! তোর
 কঙ্কালীতলার মতো পেট
 এমনিতেই জলে যাচ্ছে । তোর ঘর, তোর রাস্তা, তোর দেশ আজ
 শ্মশানের শাস্তি...

নিবস্ত চিতার ঘুম ভাঙিয়ে যে রাজা হয়, হবে । তুই এ রুটি অস্পৃশ্য জেনে
 ছুঁড়ে দে উর্ধ্বের দেবতার নষ্ট করুণার দিকে । তুই আকাশের সন্ধ্যাটের কাছে
 দাবি কর ; মানুষের শ্রম—
 অণু, ঘামে ভেজা রুটি ।

এই জন্ম

কোন্ জন্মান্তর ? এই কসাইখানার
 ভৌতিক সংগীত ; রাজপথে
 নৃত্যের মুখোসে জলে রক্ত...কার রক্ত ?
 এই জন্মে কে তুমি ? কোথায় যাও ? পথ
 যতদূর দেখা যায় নদী, শীর্ণ, লোহিত...
 নরক কোথায় ছিল এতকাল ? কেমন ঘুমন্ত
 এই শহরে ! এখনো কবিতা লেখ ?
 তুমি কেন লেখ ?
 এ তো গান নয়, ছবি নয়
 শুধু শ্মশান ! এ-জন্মভূমি কবে ছিল তোমার ?
 তোমার জন্মের লগ্নে অহঙ্কার ছিল না ? শুধুই
 ক্রীতদাস-ক্রীতদাসী শিয়রে...চারদিকে শূন্য
 প্রাস্তর, নিঃশব্দ, মৃত...

তুমি জন্ম নিয়েছিলে অনন্ত কালার মধ্যে
 অনন্ত রক্তের মধ্যে ;
 তবু স্পর্ধা, কবিতা লিখতে চাও ! স্পর্ধা শুধু...

রথের মেলায়

হাত নেই তার, দেবতা ।

পা নেই, তবু সে দেবতা ।

কেন না পেটটি তার

সত্যি চমৎকার !

সাগ্নিক

অস্থির হয়ো না ;

শুধু, প্রস্তুত হও !

এখন, কান আর চোখ

খোলা রেখে

অনেক কিছু দেখে-যাওয়ার সময় ।

এ সময়ে

স্থির থাকতে না পারার

মানেই হল, আগুনে ঝাঁপ দেওয়া ।

তোমার কাজ

আগুনকে ভালবেসে উন্মাদ হয়ে যাওয়া নয়—

আগুনকে ব্যবহার করতে শেখা ।

অস্থির হয়ো না ;

শুধু, প্রস্তুত হও !

কার তামাক কে খায় ?

(আফ্রিকার জনৈক 'পিগ্মি' আদিবাসীর বিলাপ)

বিরিটি বন, তোকা বাতাস !

তীর-ধনুক তোর হাতের মুঠোর ; এবার তৈরী হ !

এদিকে, ঐদিকে, এদিকে, আবার ঐদিকে...

একটা খাড়া গুয়োর ! কে রে, গুয়োরটাকে মারলো ?

নিকু মারলো ।

কিন্তু খায় কে ? হতভাগা নিকু !

গুয়োরটার ছাল ছাড়ালি তুই ; কাটলি কুটলি !

তোর ভোজনের জন্য বরাদ্দ হল শুধু নাড়ি-ভুঁড়ি !

শব্দ কী ! যেন কানে লাগলো তাল !

এ-যে এক বিরিটি হাতি ! একেবারে সামনে !

কে মারলো হাতিটাকে ?

নিকু মারলো ।

কে পেলো বাহারের দাঁত-দুটো ? হতভাগা নিকু !

সব সময় তুই করবি হাতি শিকার ; তোর জন্য গুয়া

রেখে দিয়েছে হাতির লেজ !

তোর বাড়ি নেই, ঘর নেই ; যেন তুই একজন বানর যে নিকু !

—মাহুব নোস !

কিন্তু মোঁমাছি তাড়িয়ে মধু জোগাড় করার বেলায় তুই !

কে ঐ মধু খায় ?—যতক্ষণ না পেট ফুলে ফেটে যাওয়ার মত হয় ?

না রে, হতভাগা ! তুই না ! তোর জন্য পড়ে আছে

শুধু কয়েক টুকরো মোম !

ঐ-যে, তোর সামনেই ব'সে, সাদা-চামড়ার ভাল মাহুবরা !

কে তাদের ঘুরে-ফিরে নাচ দেখায় ? তুই রে, নিকু ! তুই !

কিন্তু তোর তামাক খেয়ে নিলো কে ? হতভাগা নিকু !

নিহু রে ! চুপ ক'রে ব'সে থাক ! অপেক্ষা কর ! ওরা কেলে-দেবার আগে
সিগারেটের শেষ টুকরোটা কখন তোর দিকে এগিয়ে দেয় !

[বিদেশী কবিতার অনুবাদ]

কালো মায়ের স্বপ্ন / কালুনগানো

(আমার মা-কে)

কালো মা

তঁার শিশুকে দোল খাওয়ান

আর তঁার কালো চুলে ঢাকা

কালো মাথার মধ্যে

তিনি চমৎকার স্বপ্নগুলিকে

আগলে রাখেন ।

কালো মা

তঁার সোনা তঁার মাণিককে দোল খাওয়ান

আর ভুলে যান

পোড়া মাটি সমস্ত ভূট্টার ক্ষেত শুষে নিয়েছে,

গতকাল গমের শেষ দানাটিও ফুরিয়ে গেছে ।

তিনি সেই সব চমৎকার পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন

যেখানে তঁার ছেলে একদিন পাঠশালায় যাবে

এমন পাঠশালায়

যেখানে মানুষের ছেলেরা পড়াশুনা করে ।

কালো মা

তঁার শিশুকে দোল খাওয়ান

আর ভুলে যান

তঁার সহোদর ভাইয়েরা শহরের পর শহর, বন্দরের পর বন্দর গ'ড়ে তুলছে

একটির পর একটি ইঁট নিজেদের রক্তে জুড়ে দিয়ে ।

তিনি সেই সব চমৎকার পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন
যেখানে তাঁর ছেলে একদিন রাস্তায় ছুটাছুটি করবে
এমন রাস্তায় যেখানে মানুষ চলাফেরা করে ।

কালো মা
তাঁর সোনা তাঁর মাগিককে দোল খাওয়ান
আর কান পেতে শোনেন
বাতাসে দূর থেকে কী কথা, কী গান ভেসে আসছে ।
তিনি সেই সব চমৎকার পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন
সেই সব চমৎকার পৃথিবীর
যেখানে তাঁর ছেলে একদিন বেঁচে থাকতে পারবে ।

মানুষ রে, তুই

মানুষ রে, তুই সমস্ত রাত জেগে
নতুন ক'রে পড়,
জন্মভূমির বর্ণ পরিচয় !

পায়ের নীচে তোর
গভীর হচ্ছে চোরাবালির চেয়ে ভীষণ
ঘুমের শূন্যতা ;
তুই
সারাজীবন লিখলি পরের মুখের কথা,
তুই কথা !
রাজেশ্বরী অননী তোর তাই উপোসে
রাত্রি কাটায় ।

বোঝে না তোর মুখের ভাষা !

আমি কোথায় পাবো তারে ?

কোথায় পাব আমি

কঠিন সত্য টেঁচিয়ে বলার সাহস ?

জন্ম থেকেই আমি মিথ্যার মুখোশ

দেখেছি, তার অসীম স্পর্ধা !

জান না হতেই ভূত-তাড়ানোর 'ওকা

আমার অবাধ্যতাকে কান ধ'রে

ছুই গালে চড় মেরেছে ! আমি

কখনো 'নীল-ডাউন' কখনো 'চেয়ার' হয়ে

জেনেছি যার শরীরে আছে পশুর দন্ত

তিনিই আমার পাঠভবনের আদর্শ ঈশ্বর !

কোথায় পাব আমি

আমার মনুষ্যত্ব, আমার সাহস ?

আমি স্কুলের নষ্ট ছেলে অনেক দেখে, অনেক শিখে

হয়েছি পাড়ার সুবোধ বালক । স্বাধীন মহাদেশের

আমি মজার খেলনা—আমার চাকরি নেই,

ভাষণ শুনি । আমার চাকরি নেই,

পুলিস দেখলে ভয়ে পালাই ।

কোথায় পাবো আমি

মুখোশগুলি টুকরো করার সাহস ?

অরুণ বরুণ কিরণমালা

১

ঘর পাথর

পথ পাথর

পাথর কুয়ার জল

পাথর ফুল, ফল...

২

ঘর ছেড়েছে অরুণ

—পাথর

পথ হেঁটেছে বরুণ

—পাথর ;

দেখতে দেখতে আকাশ পাথর, মেঘ পাথর,

পাথর গাছশালা !

পাথর দেশে পাহাড় ভেঙে, আকাশ ভেঙে

চ'লেছে কিরণমালা...

নীলকমল লালকমল

নীলকমল লালকমল

খুঁজছে তাদের সত্যিকারের মা, লুকিয়ে যিনি মানুষ খাবেন না ।

এই দেশে নয়, ওই দেশে নয়

কোথায় আছে সত্যিকারের দেশ, সত্যিকারের আকাশ, সত্যিকারের বাতাস

খুঁজছে তারা—আজও জানে না

কোথায় আছে ভোরবেলার অমল আলোর মতো সত্যিকারের মা...

১৫ আষাঢ়, ১৩৮৩

পূর্ণ কুন্ত-মেলায় ভিক্ষুকের গান

একদা মা-কে দিয়েছিলাম দোষ,

‘তুমি কেন অর্ধেক ভিখারী ।

না-হয় আমরা ঘরে করবো উপোস ;

তাই ব’লে কি যাবে রাজার বাড়ি ?’

‘ছেলে, আমার ছেলে !

ঘুঁটে কুড়িয়ে পেট তো ভরে না ।

দোষ যদি হয় রাজার বাড়ি গেলে,

ছেলের উপোস দেখবে কি তার মা ?’

একদা মা-কে দিয়েছিলাম দোষ,
 ছিলেন তিনি অর্ধেক-ভিখারী ।
 এখন আমার রাজার সঙ্গে ভাব ;
 কিন্তু মায়ের সঙ্গে আমার আড়ি !

কবি তো অনেক

(জগন্নাথ বিশ্বাসের ডাঙা, একটি স্বীকারোক্তি)

কবি তো অনেক এই দেশে, সার্থক-জনমদের মহতী সভায়
 ছড়ায় বিদূষী বাক্ ;
 যখন হাজার শিশু রক্তকর্দমের মতো পড়ে থাকে প্রকাশ্য রাস্তায় ;
 দিগ্বিদিক অন্ধকার হ'য়ে আসে কে-বা পিতা, কে-বা মাতা, উলঙ্গের
 কান্না ও গর্জনে !

কবি তো অনেক, বুক জুড়ে সোনার মেডেল ; লেখে চতুর্দশপদী,
 চম্পু কাব্য ; আলো করে বাঁকুড়ার হাতি-ঘোড়া কৃষ্ণনগরের আহ্লাদী
 পুতুলদের জলসাঘর ;

তুমি আমি বাইরের দর্শক । রাস্তা হাঁটি
 চোখে পড়ে চাপ চাপ রক্ত, আর সমস্ত শরীর বেঁকে যায় দুঃসহ বমনে ।

আমরা কবি নই । আমাদের জন্মদিন, হা-ঘরে হা-ভাতেদের এই দেশে
 আমাদের সার্থক জনম, তাই বন্ধ উন্মাদের প্রলাপের মতো মনে হয়...

তুই পুরুষ

১

তেরশ তিরিশ মন, সতেরোই ভাদ্র
 বজ্রার জেল থেকে সুরপতি ভাদ্র
 যে চিঠি লিখেছিলেন :
 'শোনো, মনিময় সেন ।
 ইংরেজ জাতটাই অতীব অত্যাচারী...'

নির্বাচিত কবিতা

২

তেরশো আশি-ভে ফের মণিময় সেন
চিঠি পান, সুরপতি ভালই আছেন ;
এসেছেন দিল্লীতে
তামার পাত্র নিতে—
ইংরেজ-তাড়ানোতে তিনিও ছিলেন ।

‘পুনশ্চ : মণিময় ! একটাই কষ্ট—
ছেলেটা কুপথে গিয়ে একেবারে নষ্ট !
থাকতে ঘরের ভাত
থায় সে জেলের ভাত...’
(চিঠির তারিখ, ইত্যাদি অম্পষ্ট !)

এক বিদূষকের স্বগতোক্তি

‘Everything that I laughed at became sad.’—Gogol

হেসে উড়িয়ে দেবো যে, আমার চারদিকে হাসির কী আছে ?
যে দিকে চাই নরক শুধু ! হাত পা ভাঙা মানুষগুলো
জোর ক’রে লোক হাসাবে ব’লে কানে তুলো পিঠে কুলো
যে-যার রক্ত করছে পিছল অদ্ভুত এক মুখোশ-নাচে ।

নাচ যদি হয় ভাঙা হাত-পা আবার ভেঙে টুকরো করা
নাচ যদি হয় রক্তে-ভাসা মুখোশগুলির রঙিন হওয়া ;
সে-কী ভীষণ হাসির ব্যাপার—হাসি কি সেই দমকা হাওয়া,
উড়িয়ে দেবে ওই নাচ-ঘর, ডাকিনীদের ময়নাক্কা ।

কালো মানুষের গান

(পল রোবসন-কে মনে রেখে)

তুমি

পৃথিবীর কালো মানুষের গান,

অপমানিতের চোখের জলকে লাবণ্য করো

তোমার প্রেমে

আর প্রতিবাদ করো

অপ্রেমের অন্তি-স্পর্ধার !

তুমি

পৃথিবীর বিষন্ন মানুষের গান...

মাঘ, ১৩৮২

সত্যকাম শ্রীমানের জন্ম : কালবেলার কবিতা

শ্রীমান, তুমি ভাল থাকো !

তোমার মনে পাপ

আগুনে হোক শাস্ত ! যেন

পিতার অভিশাপ

জন্ম থেকে তোমাকে জলে

ভাসিয়ে না দেয় । তুমি

চারদিকে একলক্ষ সাপের

মধ্যে জন্মভূমি

জেনেছ দুঃখিনী মায়ের

মতই অসহায় !

শ্রীমান, তুমি ধৈর্য ধরো

এমন কালবেলায় ।

মানুষ নাম

‘মানুষ’ নাম

যখন বুকের ভেতর থেকে

উঠে আসে

তখন দারুণ শীতেও

আমরা আগুন পোহাই

আর আমাদের মরুভূমিগুলি

এক আশ্চর্য নদীর গানে

স্নিগ্ধ হয় ।

এখন

সময় যদিও ভয়ঙ্কর

যখন

কোনো পার্থক্যই করা যায় না

কবির সঙ্গে বেঞ্জার, একমাথা পাকা চুলের সঙ্গে

কুকুনগরের আহলাদী পুতুলদের

তবু

এখনই

এই নরকেও

‘মানুষ’ নাম, তার গভীর মস্তকের উচ্চারণ

আমাদের নিঃশ্বাসের বাতাসকে

মধুময় করে ।

আর

এই কারণেই

হৃৎকের কান্নাগুলিকে

সম্পূর্ণে বুকের মধ্যে আগলে রেখে

আমাদের সমস্ত রাত জেগে থাকে

দিন নেই রাত নেই

আমাদের বাঁচার জন্য এত লড়াই ;

মৃত্যুর মুখোমুখি,
তার অঙ্গীল বিক্রপ
তার প্রচণ্ড মারের তোয়াকা না রেখে
কবির সমাজে সমস্ত জীবন ত্রাত্য থেকেও
আমাদের এত রক্তপাত...

পৌষ-সংক্রান্তি, ১৩৮৩

রাজা আসে যায়

১

| | |
|-----------------|---------------|
| রাজা আসে যায় | রাজা বদলায় |
| নীল জামা গায় | লাল জামা গায় |
| এই রাজা আসে | ওই রাজা যায় |
| জামা কাপড়ের | রং বদলায়... |
| দিন বদলায় না ! | |

গোটা পৃথিবীকে গিলে খেতে চায় সে-ই যে স্রাংটো ছেলেটা
কুকুরের সাথে ভাত নিয়ে তার লড়াই চলছে, চলবে।
পেটের ভিতর কবে যে আগুন জ্বলেছে এখনো জ্বলবে !

২

রাজা আসে যায় আসে আর যায়
শুধু পোশাকের রং বদলায়
শুধু মুখোশের ঢং বদলায়...
পাগলা মেহের আলি
ছই হাতে দিয়ে তালি
এই রাস্তায়, ওই রাস্তায়
এই নাচে, ওই গান গায় :
'সব ঝুট হয় ! সব ঝুট হয় ! ঝুট হয় ! সব ঝুট হয় !'

৩

জননী জন্মভূমি

সব দেখে সব শুনেও অন্ধ তুমি !

সব জেনে সব বুঝেও বধির তুমি !

তোমার গ্যাংটো ছেলেটা

কবে যে হয়েছে মেহের আলি,

কুকুরের ভাত কেড়ে খায়

দেয় কুকুরকে হাততালি...

তুমি বদলাও না ;

সে-ও বদলায় না !

৪

শুধু পোশাকের রং বদলায়

শুধু পোশাকের ঢং বদলায়...

বিষন্ন মানুষের গান

(কাজী মজরুল ইসলামের নির্বাক পাথরের মূর্তি স্বপ্নে দেখে)

শগুনের শ্রামলী লক্ষ্মী আর পিপাসার জল সরস্বতী কবিতা আমার ;

সমস্ত জীবন আমি তোমাদের মুখ দেখি, স্বদেশের বিবাদ প্রতিমা

সমস্ত জীবন আমি তোমাদের শুভ্র স্তনে স্পর্শ করি আসমুদ্রহিমাচল কান্নার লবণ

অথবা তুষার সব, ভারতবর্ষের নদী, বিশল্যকরনী বৃক্ষ, তোমার আমার জন্মভূমি ।

আমার ঈশ্বর নেই

আমার ঈশ্বর নেই ব'লে

সবাই আমাকে উপহাস

কুঁড়ে দেয় । অথচ আমি যে

ঈশ্বর বানাই, বারোমাস
তাই তারা কিনে নেয় ঘরে ।
নিরীশ্বর মাথার উপর
আমি খুঁজি আকাশের রঙ
তিনি সপ্তর্ষির মূহুর

কুরাশায় । স্বর্গীয় বাতাস
মুখে ক'রে কীর্তনের দল
ঘরে ফেরে । ভক্তেরা ঘুমায় ।
তাদের ঈশ্বর অন্তর্জল
পদ্য হয়ে স্বপ্নের ভিতর
হাওয়া দেন ।...নিষিদ্ধ আধারে
আমি খুঁজি আমার পাথর
মেঘে, বজ্রে, শূন্যে, তেপান্তরে ।
২৮ ভাদ্র, ১৩৮৪

সেই অহঙ্কার আমাদের, সেই স্পর্ধা

অহঙ্কার থাকা ভাল ;
কিন্তু নিজেকে নিয়ে নয় ।
স্পর্ধা থাকা ভাল :
কিন্তু দল, এমনকি দেশকে নিয়েও নয় ।

সেই অহঙ্কার আমাদের মানায় :

আমি একজন মানুষ, সমস্ত পৃথিবীর নাগরিক আমি ।

সেই স্পর্ধা আমাদের ভাল রাখে :

মানুষের চেয়ে নির্মল এই পৃথিবীতে কিছুই নেই,

আমারও অধিকার আছে মানুষকে ।

অহঙ্কার থাকা ভাল

যে অহঙ্কার আমাদের উদার হতে শেখায়, বিনীত করে, এবং

অন্ধকারে স্থির থাকার শক্তি দেয় ।

স্বর্ধা থাকা ভাল

যে স্বর্ধা আমাদের কানে মজ্র দেয় : 'মানুষকে ভালবাসো।

মানুষের জন্য বাঁচো !

আর, যদি কখনো প্রয়োজন হয়—মানুষের জন্যই মরে যাও ! তুমি মানুষ !

সংশোধিত

মার্চ ১৯৭৭

লিখতে হয় লিখবি কবিতা

লিখতে হয় লিখবি কবিতা

কিন্তু মনে রাখিস

জীবন নয় কবিতা এই উলঙ্গের হাড়ের পাহাড়,

নিরন্তর চোখের জলের নদী—

যাদের তোরা দেশ ব'লেছিস, প্রেমিক !

লিখতে হয় লিখবি কবিতা

কিন্তু যদি সত্যিকারের ভালবাসিস জন্মভূমির মানুষ

তাহলে তার জন্য আগে কাপড় বোন, আগুনে সৈঁক রুটি।

স্থির চিত্র

(শ্রী:গোপাল মৈত্র, স্মৃতিস্মরণে)

সবই তো এক রকম

আমাদের চোর পুলিশ স্কুল কলেজ হাসপাতাল,

এই দেশে মানুষের পা রাখার জায়গা কোথায় ?

এখানে শিশুরা আসে জন্মনিয়ন্ত্রণের হুকুম মেনে :

এখানে বেকার যুবকরা মাইলের পর মাইল

এম্প্রয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের লম্বা কিউয়ের সামনে দাঁড়িয়ে

এক প্রাগৈতিহাসিক স্মৃতির স্মরণার্থে
তাদের বুকের হাড় আর পিঠের চামড়া খুলে দেয়
যা তাদের বেঁচে থাকার মান্ডল ।

কিছুই বদলায় না । আমাদের স্বপ্নগুলি
বিকলাঙ্গ ভিক্ষুকদের মতো
সমস্ত দিন, সমস্ত রাত যাকেই সামনে পায়
তারই পা জড়িয়ে ভিক্ষা চায় ;
যে দৃষ্ট আমরা জন্ম থেকে দেখে আসছি

তবু আমরা অপেক্ষা করি ; এক মন্ত্রী যায়, অন্য মন্ত্রী আসে
আমরা তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি ।
আমাদের বুকের ভেতর বোবা শব্দগুলি আর একবার মুখর হয়ে ওঠে :
‘আম্মা ! মেঘ দে ! পানি দে !’
আর প্রতিশ্রুতিগুলি কাগজের নৌকার মতো
বর্ষার একইটু জলে ইতস্তত ভেসে যায় ।

বন্দী প্রমিথিউস

পশুরা
তার তেজে
দগ্ধ হয়েছে ।

তাই তারা
প্রতিশোধ নিয়েছে ।

তাদের পাশবিকতা
খুবলে নিয়েছে তার শরীর থেকে
তার রক্ত
তার মাংস ।

কিন্তু সে

তার আধ-খাওয়া শরীরের ভিতর

আজও সযত্নে বহন করে

আগুনের পরশমনি,

তার বন্দী জীবনের

মহুগুহ

তার

প্রতীক্ষা করে,

কয়েদখানার কঠিন শুষ্ক পাথরের ভিতর

একদিন অঙ্কুরিত হবে

তার গান...

একলা জেলে বন্দী তিনি

একলা জেলে বন্দী তিনি

শোনে, দূরে চিড়িয়াখানার

বাঘ ডাকছে। আবার কখন

বাঘের ডাককে ছাড়িয়ে যায়

একশো গাধার জয়ধ্বনি

দিন দুপুরে—শোনে তিনি।

শুনতে শুনতে ভাবেন তিনি

বাঘের তাতে কী আসে যায় ?

মাহুঘের বা কী আসে যায় ?

অমৃত মহাশ্বেতা

তোমার কলস ভর্তি জল ছিল ; কিন্তু আমি সেই জল স্পর্শও করিনি,
 কেননা তোমার মুখে মানবীর লাবণ্য ছিল না ।
 আমার মহাশ্বেতা দেবী নয়, তার মুখের অমলতা স্পর্শই জলে না !
 বরং সে করুণায় স্নান !

তুমি সোনার কলস কাঁখে চলে যাও...

আমি মাটির কলস ছাড়া পিপাসা জানি না ।

দিবস-রজনীর কবিতা

ঘুম পাড়ানি মাসিপিসি
 কুয়াশা নাচায় মাঘের ভোরবেলা ।
 গভীর ঘুমে সূর্য পড়ে ঢাকা ।
 মেঘেরা যায় তিনপাহাড়ের কান্না ভেঙে
 দারুণ শীতে ।

তবু হাজার হলুদ ফুল
 ব্যাথায় নীল আমার দেশের আধার ছুঁয়ে
 কাঁপায় আগরণের বিভাবরী...

ভালোবাসার মানুষ

ভালোবাসার মানুষ
 গীর্ঘ নদীর মতো
 নতজানু
 কখন আকাশ ভেঙে নামবে
 চোখের জল...

বানভাসি

দেখে এলাম সেই মহাদেশ, যার নদীতে
বাঘ ও ছাগল একসাথে জল খায়
এবং মানুষ লঙ্করখানায় যায়
প্রতি বছর বেঁচে থাকার খাজনা দিতে ।

ইতিহাস-স্মার

আমাদের ইতিহাস-স্মার
যা জানেন—
নীল ডাউন
চেয়ার
কানমলা ।

এই বিজ্ঞা নিয়ে
তিনি আমাদের শেখান
সত্যতা
সংস্কৃতি
ও
রাজনীতি ;
অর্থাৎ—
কানমলা
চেয়ার
নীল ডাউন ।

যখন ক্লাশের ঘণ্টা শেষ হয়
তিনি
আমাদের বিকেলটাকে
একঘণ্টা ডিটেন করিয়ে
তার শেষ-কর্তব্য
অতিশয় নিষ্ঠার সঙ্গে সমাপন করেন ।

তখন

লোডশেডিং-এর মতো মুখ ক'রে

আমরা

যে-যার বাড়ি ফিরি।

আর

এইখানেই তো

আমাদের রাজনীতি

সংস্কৃতি

ও

সভ্যতা...

তাপ্তি আর ওভারকোটের গান/বের্টল্ট ব্রেশট

যখনই আমাদের শীতের ওভারকোট ছিঁড়ে ন্যাকড়ার মতো হয়ে যায়

আপনারা ছুটতে ছুটতে আসেন আর বলেন : এভাবে আর চলতে পারে না ;

তোমাদের যতভাবে সম্ভব সাহায্য করতেই হবে।

আর অসীম উৎসাহ নিয়ে আপনারা ওপরতলায় ছুটে যান

যখন আমরা, যারা শীতে জমে যাই, অপেক্ষা করতে থাকি।

একসময় আপনারা ফিরে আসেন আর বিজয়ীর মতো

আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন, যা যুদ্ধে জিতে এনেছেন—

একটুকরো তালি-দেওয়া কাপড়।

চমৎকার, এটা যে একটা টুকরো কাপড়

সন্দেহ নেই ;

কিন্তু আস্ত ওভারকোটটা কোথায় ?

যখনই আমরা খিদের জ্বালায় গলা ফাটিয়ে চিৎকার করি

আপনারা ছুটতে ছুটতে আসেন আর বলেন : এভাবে চলতে দেওয়া যায় না

তোমাদের যতভাবে সম্ভব সাহায্য করতেই হবে।

আর অসীম উৎসাহ নিয়ে আপনারা বড়-মাখাদের কাছে ছুটে যান

যখন আমরা, যারা উপোসে জলি, অপেক্ষা করতে থাকি ।
 একসময় আপনারা ফিরে আসেন আর বিজয়ীর গর্বে
 আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেন, যা আমাদের জন্তু জিতে এনেছেন—
 রুটির একটা ছেঁড়া টুকরো ।

চমৎকার, এটা যে একটা টুকরো রুটি
 সন্দেহ নেই ;
 কিন্তু আস্ত রুটিটা কোথায় ?

আমাদের যা দরকার তা এক টুকরো তাল্লির চেয়ে অনেক বেশী,
 আস্ত ওভারকোটটাও আমরা চাই ;
 আমাদের দরকার একফালি রুটির চেয়ে অনেক বেশী,
 আমরা চাই আস্ত রুটিটাকেই ।
 শুধু গতরখাটার কাজ নয়, আরও অনেক কিছু আমাদের চাই —
 গোটা কারখানাটাই, কয়লা আর ইল্পাত, সবকিছু আমাদের দরকার ।
 আমরা চাই আমাদের রাষ্ট্র আমরাই চালাবো ।

সুন্দর, এ হলো আমাদের যা
 মোটামুটি দরকার ;
 কিন্তু আপনারা আমাদের জন্তু
 হাতে ক'রে কী এনেছেন ?

মে-দিনের সংবাদ

মে-দিন কি আমাদের মুখের উজ্জলতা ?

অথবা অন্ধকার আরও গাঢ় হয় ;

হঠাৎ আঁজুলে লাগে মুখোশ ;

আমাদের চোখের পাতায় আজ কি দিন

কি রাত্রি সব পাথরের মতো ভারি !

নাকি, সংবাদেই সব স্বথ ?

আধার যায় না : জন্মদিনের কবিতা

আধার যায় না । এক মন্ত্রী যায়

অন্য মন্ত্রী আসে

কবির সভায় । তারা কবিতা পড়ে না, তবু

তারা কবিতার সারাংশায়

ব্যাখ্যা করে । আধার যায় না । শুধু

জন্মদিনে কলকাতার আকাশে, বাতাসে

ভূতুড়ে আলোর মতো ছায়া ফেলে মাননীয়

মন্ত্রীদের মুখের বাহার !

খাংটো ছেলে আকাশ দেখছে

ঘর ফুটপাথ

আহার বাতাস,

খাংটো ছেলেটা

দেখছে আকাশ ।

সেখানে এখন

টেকা সাহেব

বিবি ও গোলাম—

রাজ্যের তাস

সবাই ব্যস্ত ;

সবাই করছে

চাঁদ সূর্য ও

তারাদের চাষ ;

সবাই চাইছে

রাজত্ব, আর

সবাই লিখছে

দারুণ গল্প ।

সেই শুধু ফুট-

পাথের জ্যাংটো

ছেলে, তাই তা

বুদ্ধি অল্প—

দূর থেকে তাই

দেখছে দৃশ্য,

দেখছে এবং

দিচ্ছে সাবাস !

আবহমান বাংলার কবিতা

‘খোকা ঘুমালো পাড়া জুড়ালো বর্গী এলো দেশে,

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কীসে ?’ —ঘুমপাড়ানী ছড়া

বর্গীর চেয়েও

কে ভীষণ

বুলবুলি, ধান খেয়ে যায়

হেমন্তে

চাষীর ঘরে

কুপিও জলে না, শিশু

পাখি দেখে ভয় পায়

সোনার বাংলায়

মুঠি মুঠি সোনা ধুলো হয়, জননীর

মুখে ঘুম-পাড়ানীর গান

মনে হয়

বুক থেকে উঠে আসা

বাংলার শপথ

রক্তে ভাসে !

সংশোধিত

এক অন্ধকার থেকে

এক অন্ধকার থেকে আর এক অন্ধকারে

আমাদের কান্নাগুলি ক্লান্ত হেঁটে যায় ।

চারদিকে হলুদ পাতা, কুয়াশা, হায়নার ডাক :

‘কারা যায় ? কেন যায় ? কত দূরে ? কোথায় ? কোথায় !’

পাষাণের চেয়ে ভারী দীর্ঘশ্বাসগুলি ক্রমে

তাদের ঘনিষ্ঠ হয়, অন্ধকারে গলা চেপে ধরে :

‘দাম-জীবনের গান জানো যদি, তাই শোনাও—

কোথা যাও ? দেখ না কি, সামনে আকাশ ভেঙ্গে পড়ে !’

ভগ্নজাহ্নু, তবু তারা বুক-হেঁটে সামনে চলে

অবেলা ছাড়িয়ে অন্ধ কালবেলায় দিকে—

যেখানে কবির পড়ে আনন্দ-ভৈরবী ! মুক্তমেলার আলোয়

চোখে পড়ে গুলিবিদ্ধ হাজার হাজার শিশু, রক্তকর্দমের মত, যাদের

বুকের রক্ত কবির রক্তের চেয়ে ফিকে...

একটি অসমাপ্ত কবিতা ২

(নিহত প্রবীর দত্ত-কে মনে রেখে)

মাথায় ওপর সূর্যাস্তের অন্ধকার হ’য়ে আসা আকাশ

আর পায়ের নিচে নিহত কিশোরের খুনে লাল মাটি ;

কলকাতার কার্জন পার্ক ;

তোর বিশেষ জুলাই, তোর গান, তোর শপথ
তোর ভিয়েতনাম

মানুষের রক্তের ভিতর, তাকে কেড়ে নিতে পারে
এমন লাঠিয়াল ভূত, এমন মানুষ-খেকো বাঘ
পৃথিবীতে কোথায় আছে ?

আমাদের মাতৃগর্ভগুলি
এই নষ্ট দেশে, চারদিকের নিষেধ
আর কাঁটাতারের ভিতর

তবু প্রতিদিন
রক্তের সমুদ্রে মাতার-জানা হাজার শিশুর জন্ম দেয়
যারা মানুষ...

কেন আমাদের শিশুরা

কেন আমাদের শিশুরা ঘুমের মধ্যেও কালোগাড়ি দেখে
‘পুলিস ! পুলিস !’ বলে চিৎকার ক’রে ওঠে ?

কেন আমাদের কিশোর ছেলেরা ভরছপুরে রাস্তার পুলিস দেখলে
ভয়ে বিবর্ণ হ’য়ে অস্ত্র ফুটপাথ দিয়ে হাঁটে ?

কেন আমাদের জোয়ান ছেলেদের গুলি ক’রে মাথার খুলি আর
জুতো দিয়ে বুকের পাজরা খেঁতলে দেওয়া হয় ?

কেন আমাদের যুবতী কন্যাদের সিঁথির সিঁদুর আর চোখের জল
একটিই রক্তের নদী হ’য়ে যায় ?

কেন চোর ডাকাত আর খুনীদের জন্য এই দেশ
আর দেশের জেলখানাগুলি আমাদের পারের নিচের একমাত্র শত্রু মাটি ?

কেন ?

সংশোধিত

হিতোপদেশ : অস্থিরমতি বালকদের জন্য

‘The fear of the Lord is the beginning of knowledge.’

—The Bible

জ্ঞান তো তর থেকেই

যেমন গুরুমশাইয়ের বেত থেকে

আমাদের ‘অ আ ক খ’ শেখা।

প্রথমে তর তারপর ভক্তি

তারপর মথিলিখিত সুসমাচার

আর এই ভাবেই সমস্ত বর্ণপরিচয়টা

একদিন আমাদের মুখস্থ হয়ে যায়।

বাল্যে উপবাস, যৌবনে কর্মহীনতা

বার্ধক্যে ভিক্ষা :

যত তর ততই আমরা জন্মভূমির রক্ত সারা গায়ে মেখে

জ্ঞানের পর জ্ঞান আহরণ করি ; ক্রমেই জ্ঞানের জাহাজ হয়ে যাই

যদি না পোকায়-থাওয়া জংপিণ্ডটার ধুকধুকানি

ইতিমধ্যেই একেবারে থেমে যায়।

এই ভাবেই ঈশ্বর আমাদের ভয়ের পরীক্ষা নেন,

আর ঐ কঠিন পরীক্ষায় পাশ করার পর

যদি তখনো আমাদের বুকে হাড়, পিঠে চামড়া বলে কিছু অবশিষ্ট থাকে

তিনি তাঁর একনম্বরী পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি আমাদের দিকে এগিয়ে দেন

যার অর্থ : আমাদের জ্ঞান এখন তুঙ্গে—

এখন চোখ বুঁজলেই আমরা সোজা স্বর্গে চ’লে যেতে পারি

এবং অর্জন করতে পারি অনন্তকাল ধ’রে তাঁর পদসেবা করার দুর্লভ

অধিকার ৮

নির্বাচিত কবিতা

শিশুদের রক্ষা কর

(লুইস-এর 'A Madman's Diary' সামনে রেখে)

১

শিশুদের রক্ষা করো

যেন তারা মানুষের মাংস না খায় ।

সেই সব শিশুরা, যাদের ভাতের সঙ্গে এখনও নরমাংস মিশিয়ে

দেওয়া হয় নি,

যে ভাবে পারো

এই ভয়ঙ্কর পাপ থেকে তাদের বাঁচাও ।

২

চার হাজার বছর ধরে

এই মহাদেশের

আর এই রকম যে সব দেশ পৃথিবী শাসন করে,

তাদের

সম্মান সন্ততিরা

সবাই মানুষের মাংস খেয়ে বড় হ'য়েছে, কেউ সজ্ঞানে, কেউ নিজের অজান্তে,

একজনও বাদ যায় নি ; কেউ বলতে পারে না

তার খালার প্রতিটি ভাত সাদা ।

৩

তুধু, যে-সব শিশু এখনও মায়ের বুকের দুধ খায়

যাদের দাঁত উঠতে আরও কয়েক মাস বাকি,

এখনও সময় আছে, যদি তোমরা শপথ নাও—

তোমরা, যারা এই পৃথিবীতে থেকেও জ্ঞান-পাপী নও,

মানুষের মাংসের গন্ধে যাদের পেট থেকে ভাত উঠে আসে,

খাওয়া মানেই যাদের বমি করা —

যদি তোমরা সংযত হও,

তোমরাই পারো, একমাত্র তোমরাই পারো

শিশুদের বাঁচাতে ।

৪

তোমাদের যা সর্বনাশ হওয়ার
তা হয়েছে ;
এখনও সময় আছে
যে সব শিশুরা মায়ের বুকের দুধ ছাড়া
আর কিছুই স্পর্শ করে নি
তাদের জন্য একটি সহজ পৃথিবী সৃষ্টি করার ;
চার হাজার বছরের পুরানো পৃথিবীটাকে
নষ্ট আবর্জনার মতো
যে-দিকে ছুঁচোথ যায়, ছুঁড়ে দিয়ে ।

বসেছে আজ রথের তলায় স্নানযাত্রার মেলা

সেই মেয়েটি
বাজিয়েছিল তালপাতার এক বাঁশি,
রথের মেলায় এক পয়সায় কেনা—
রবি ঠাকুর দেখেছিলেন এক-মুখ তার হাসি ;
দেখেছিলেন, দেখে তিনিও শিশুর মতো হয়েছিলেন ।

দেখতে দেখতে দেখতে দেখতে
হঠাৎ চোখে পড়লো কবির, বিষন্ন এক ছেলে
রথের মেলায় একা ;
একটি রাঙা লাঠি কিনতো, একটি পয়সা পেলে—
কোথায় পাবে সেই পয়সা ? যার নেই তার কিছুই যে নেই
দেখতে দেখতে কবির মাথার চুলগুলি সব সাদা

দৃশ্য শুধু রথের মেলায় ? দেশ জুড়ে এই হাসিকান্নার তুফান
এই তুফানে কবি দেবেন পাড়ি ;

কিছু কোথায় ? যার আছে তার সবই আছে, যার নেই তার
বুকের মধ্যে শুধুই কাগজ—
বৃষ্টিতে যায় রথের যেনা ভেসে !

রাজধানীর পিঁপড়ে

‘পিপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে...’

নাচছে ওরা ‘তাধিন্ তাধিন্ !
আমরা স্বাধীন...স্বাধীন...স্বাধীন !’
নাচছে ওরা—নাচতে দিন ।

পিঁপড়ের পাখা গজালে পিঁপড়ে
উড়তেই চায় ; উড়তে উড়তে
ঘুরে ফিরে তারা নাচ দেখায়—
উড়তে দিন ।

‘ধিন্তা তাধিন্, ধিন্তা তাধিন্ !
দেশ স্বাধীন...তুই স্বাধীন...আমি স্বাধীন !’—
এর পিঠে ছুরি মেরে, ওর কাঁধে চ’ড়ে স্বাধীন !...
স্বাধীন...স্বাধীন...
পিঁপড়ের পাখা গজিয়েছে যদি, উড়তে দিন, নাচতে দিন ।

উড়ুক পিঁপড়ে, নাচুক পিঁপড়ে ; উড়তে উড়তে
নাচতে নাচতে মরুক পিঁপড়ে—

মরতে দিন ।

চলচ্চিত্র

টুপি মাথায় মানুষ
বুড়ো আঙুলে আকাশ মাপছে
মানুষটা
ব্যাঙের ছাতার মস্ত টুপি মাথায় দিয়ে,
বামনের দেশে ।

চোরের মা
চুরির ধন আগলে রাখেন মা :
ছেলে
আজ আছে মন্ত্রী, কাল নেই ।

সময়, স্বদেশ, রাজনীতি
মনে হয়
কোথাও এই অমানুষিকতার
শেষ আছে ।

ভাবতে ভাল লাগে ।

কালকেতু-ফুল্লরার গল্প

(মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' মনে রেখে)

ফুরায় না
ফুল্লরার বারমান্য
আর
শূণ্য হাতে কালকেতুর
ফিরে আসা

ঘরে

মুখোমুখি

দারুণ উপবাসে ;

কুরায় না

ছুটি অসহায় মানুষের

সারাদিন

ক্ষুধায় জগতে থাকা

সারা রাত...

তবু

তারি স্বপ্ন দেখে

মাঠ-ভর্তি ধানের

আর

বুক-ভর্তি ভালবাসার

আর

স্বপ্ন দেখতে দেখতে

কালকেতু রাজা হয়, কুল্লরায় মুখে

আবির লাগে ।

ভয় দেখানোর গল্প

ছোট্ট মেয়ে মায়ের গলা জড়িয়ে বলে, 'মা,

তুমি ভয় পেওনা !'

'মা মনি, তুই চুপ কর । বাইরে

দরজা ছিঁড়ছে বাঘ ।'

'আমার বাবা বাঘ-তাড়ানোর মন্ত্র জানে

আমার দাদা বাঘ-তাড়ানোর মন্ত্র জানে ।'

‘মা মনি, তুই চূপ কর। বাইরে
দেয়াল খুঁড়ছে সাপ।’

‘আমার বাবা সাপ-তাড়ানোর মন্ত্র জানে
আমার দাদা সাপ-তাড়ানোর মন্ত্র জানে।’

‘চূপ কর ! চূপ কর ! বাইরে পুলিশ !’

(হাতের লাঠি হাতে, বাবা পাথর !
হাতের লাঠি হাতে, দাদা পাথর !)

‘মা মনি, তুই চূপ কর ! চূপ কর !’—

বলতে বলতে মা
দেখেন মেয়ে দারুণ ভয়ে পাথর, চোখে পলক পড়ে না !
ঘরে বাইরে কোথাও একটু বাতাস নড়ে না।

আর এক আরম্ভের জন্ম

১

বুঝতে পারছি
আমার ডান কঁধ থেকে
হাতের পাঁচটা আঙুল পর্যন্ত
কিছু একটা হতে চলেছে।

বোধ হয়
এরই নাম ভয় !

তা ছাড়া
বয়েসও তো ক্রমেই বাড়ছে
চুল পাকছে
একটার পর একটা দাঁত খসে পড়ছে ,

চোখের মধ্যে মাঝে মধ্যেই মনে হয়
কেমন যেন একটা অঙ্ককার !
মাঝে মধ্যেই
দিনছপুয়ে আমি ভূত দেখি,
ভূতের হাসি শুনতে পাই ;

কিন্তু কাছে গেলেই
চের পাই, কোথাও কেউ নেই
কিছু নেই,
শুধু বাতাস...

বোধ হয়
এখন থেকে আমি নিজের জগৎ
একটি কৈফিয়ত তৈরী করছি,
যাতে আমার ভয়কে
দেখায় অনেকটা পাথরের মতো
আর আমার ভাঙা কলমটাকে মনে হয়
সে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে ।

২

আমার ডান হাতে
সবশুদ্ধ পাঁচটা আঙুল ;
একটা কবিতা লিখতে
এতগুলো আঙুলের দরকার হয় না ।

কিন্তু কলমটা আস্ত থাকা চাই ।

নইলে
আমি যদি একটি প্রেমের কবিতা লিখতে চাই,
সেই কবিতাটি দশ পা হাঁটতে গিয়ে
হয়তো তিনবার আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে !

আর তখনই
 আমার কাঁধের ব্যাথাটা
 আমার পাঁচটা আঙুলকে
 চোথ লাল ক'রে হুকুম করবে :
 'এবার থামো !—
 তোমাদের কি কবিতা না লিখলেই নয় ?
 কে পোছে এই সব কবিতাকে ?
 এখন কি কবিতা লেখার সময় ?'

বোধ হয়
 এরই নাম ভয় ।

কিন্তু তবু
 আমি প্রাণপণ চেষ্টা করছি
 একটি কবিতা লিখতে—
 আমি এখনই থামতে চাই না ।

৩

একটি কবিতা লিখতে লিখতে
 একটি ভয়ের কবিতা লিখতে লিখতে
 আমি এখন
 প্রাণপণে সেই বাতাসটাকেই
 আবার খুঁজছি ।

হোক বাতাস,
 তবু আমার চারপাশের গভীর শূন্যতাকে
 সে-তো পারে, সে-ই পারে
 একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে চিংকার ক'রে ব'লে উঠতে :

'এসো সাঙোত ! লড়ে যাও !—
 বিনা যুদ্ধে তোমাকে আমি নৃচ্যাব্র মেদিনীটুকুও
 ছেড়ে দেবো না ।'

আমি

একটা তেপান্তরের মতো ঘরের মধ্যে
নির্জন, একাকী আমি আমার ভাঙা কলমটাকে
তিন আঙুলের তেতর শক্ত ক'রে ধ'রে
তখন যে-কবিতা লিখবো
তা নিশ্চয় কোনো কুঁজো হয়ে আসা কাঁধের
ভৌতিক হুকুম পালন করবে না।

আমার ছ'চোখে ক্রমেই ঘন হয়ে আসছে অন্ধকার
তা আশ্রক,
আমি তো এখন শ্মশানের দিকেই
এক-পা বাড়িয়ে আছি।
তা'হলে আর কাকে ভয় ?
কিসের ভয় ?

বরং আমি আমার পুরোনো কলমটাকে
এবার চিরদিনের জন্য বিশ্রাম দিয়ে
একটি নতুন লেখার-কলম কিনে আনবো,
তাকে দেখতে লাগবে একটি নবজাতক শিশুর মতো—
যার হাসি আর যার কান্নায় কোনো পাপের স্পর্শ লাগে নি ;
তবু প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিদিন যে হাঁটি-হাঁটি পা-পা ক'রে
এগিয়ে যাবে পাপের দিকে, নরকের দিকে
মিশে যাবে মানুষথেকো মানুষদের মধ্যে—

কিন্তু তার স্বপ্ন থেকে যাবে...

একটি ছোটখাটো মানুষের বুকের মধ্যে, অল্প একটু জায়গা জুড়ে,
আর তার পৃথিবীটা ক্রমেই বড় থেকে আরও বড় হতে থাকবে।
সেই নতুন পৃথিবীর জন্য
তুখু তার জন্যই
আমি আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই ;

কেননা, আমার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা
 আমাকে হাজারবার কান ধরে ওঠ-বোস করালেও
 একই সঙ্গে আমাকে এই অভয় মন্ত্র দিয়েছে,
 ভয় দেখানোর মাস্টারমশাইরাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সত্য নয় ;
 ভূত, রাক্ষস, মানুষ-থেকো, এমনকি সাক্ষাৎ মৃত্যুও নয় ;
 আসল সত্য রয়েছে আমার মায়ের দেওয়া
 ছোটবেলার স্বপ্নের মধ্যে
 যা আমার বুকের ভেতর থেকে কেউ কোনোদিন ছিনিয়ে নিতে পারবে না ।
 আমি আর-একবার সেই আশ্চর্য স্বপ্ন
 যা আমার হারিয়ে যাওয়া কবিতা
 যা আমার এবং যে-কোনো মানুষের একটিই বেঁচে থাকার পৃথিবী—
 তাকে খুঁজে বের করবো ।
 সে জন্ম আমাকে যত মূল্যই দিতে হোক ।

জানুয়ারী, ১৯৮০

একটুকরো লাল কাপড়

১

লাল টুকটুকে একটুকরো কাপড়
 তাকে নিয়ে এত কাণ্ড !
 রাশিয়ায় চীনে কিউবায় ভিয়েতনামে
 মানুষগুলি ঐ কাপড়টাকে নিশান বানিয়ে
 গান গাইতে গাইতে, গান গাইতে গাইতে
 যেন সবাই পাগল ! যেন সবাই রাজা !

মাঝে মাঝেই সময় তাকে নিয়ে
 আশ্চর্য রূপকথার গল্প বানায় ।
 সময় তখন যেসব কবিতা বলে
 তা শুনতে শুনতে আমাদের বুকের ভেতর
 রক্তের নাচন লাগে ।

তখন রাস্তা দিয়ে একজন মানুষকে হেঁটে যেতে দেখলে
আমরা তাকে জড়িয়ে ধরি। তার চাঁদ-কপালে
তখন যেন আলোর বান ডাকে !

মাঝে মধ্যেই সময়
আমাদের গভীর ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে।
তখন আমাদের পৃথিবী
সত্যিকারের মানুষের পৃথিবীর মতো মনে হয়।
আমরা সেই পৃথিবীর পায়ের নিচের মাটিকে
চুমু খাই ! তার ধুলো
শিশুর হাসির মতো লাগে, তার বাতাস
সেই হাসিকে চারদিকে ছড়িয়ে দেয়।
তখন পাখি জাগে, ফুল জাগে, মানুষ জাগে...

২

লাল টুকটুকে এক টুকরো কাপড়
সময় তাকে রাজা বানায়।
আবার, সময় যখন দুঃসময়
সেই কালবেলায়
লাল নিশানকে নিয়ে কী খেলা,
কী সর্বনাশের ভয়ঙ্কর খেলাই
তোমরা দেখাও ! তোমরাই ! যারা একদিন
আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়েছিলে, আমাদের পায়ের নিচে মাটি
আর মাথার ওপর আকাশ দেখিয়েছিলে !
এখন একটা পাখিকে দেখে, যদি আমরা বলি : পাখি,
একটা ফুলকে দেখে যদি বলি : ফুল,
তোমাদের ছ'কানে আগুনের হুঁকা লাগে !
একটা লাল নিশানকে বলতে
এখন তোমরা বোঝো
তোমাদের হাতের লাল নিশান !

সেই লাল যদি আমার দেশের ছোট্ট একটি শিশুর রক্তে
আরও গভীর লাল হয়,
তোমাদের কিন্তু আসে-যায় না।

মাঝে মাঝেই সময়
আমাদের দিনছপুবে ঘুম পাড়াতে চায়।
তখন আমাদের চোখের পাতায় কাঁটা লাগে :
হাত ছুটো শিকল আর পা পাথরের মতো ভারী হয়ে যায়
তখন আমাদের চোখে ঘুম, কপালে ঘুম
হাতের আঙুলে ঘুম, পায়ের পাতায় ঘুম...
ঘুম !... ঘুম !... ঘুম !...

৩

কে জাগে ?—নীলকমল জাগে।
কে জাগে ?—লালকমল জাগে।
'দুই ভাই নীলকমল লালকমল
তোরা যে মাটিতেই পা রাখিস
আজ সেখানেই রক্তনদী !
যে আকাশেই তোরা হাত বাড়াস
সেখানেই হাড়ের পাহাড়।'
'বেলা আমাদের অবেলা, আমরা পার হয়ে যাবো !
বেলা আমাদের কালবেলা, আমরা জেগে থাকবো।'...
লাল টুকটুকে একটুকরো কাপড়,
তুমিও জেগে থাকো ! যখন রাত গড়িয়ে প্রভাত
আর ভোর গড়িয়ে দুপুর
তুমি জেগে থাকো ! কিন্তু সময়
এখন ডাকিনীর মস্ত পড়ছে ; সে ক্রমেই
ভীষণ থেকে আরও ভীষণ হচ্ছে !
তুমি যেভাবেই পারো, জেগে থাকো !

